

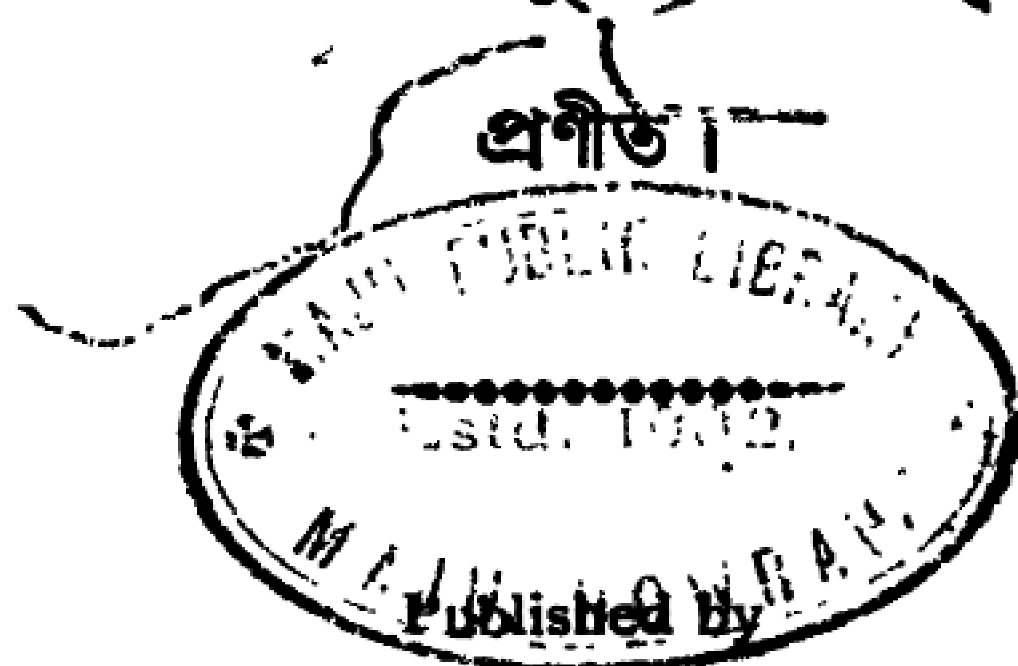
জীবন্তের প্রেতকৃত্য।

(উপন্যাস)



শ্রীমোহিতকুমার বাক্‌চি

প্রণীত।



Published by
KISHORY MOHUN BAGCHI
OF
Messrs P. M. BAGCHI & Co.,
38/1, Musjidbaree Street, Calcutta.

সন ১৩২২ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

PRINTED BY—NUTBIHARY ROY.

India Directory Press.

38/1, Musjidbaree Street, Calcutta.



জীবন্তের প্রেতকৃত্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উত্তরপাড়ার ঈষৎ উত্তরে পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের বাটী-খানি ঐ দেখা যায়। চারিদিকে রঙ্গচিত্রের বেড়া—কাক কোঁকিলে কুজনও করিতেছে; কিন্তু বাটিখানির আশু সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। সাংসারিক অবস্থা প্রতিকুলা-চরণ করায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সে বিষয়ে বিরত থাকিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ লোকের অবস্থা এই-রূপ দেখা যায়। বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ করা দূরের কথা, পূর্ব্বপুরুষগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা রক্ষা করিতেও আমরা সক্ষম নহি। কারণ গৃহাদি বহুদিনের হইলে মধ্যে-মধ্যে মেরামতের প্রয়োজন—উহা ব্যয়-সাপেক্ষ। আমরা কোন প্রকারে দুইবেলা দুই মুঠা, কেহবা এক সন্ধ্যা পেটে খাইয়া জীবিত আছি মাত্র। একার্য্য পণ্ড পল্লীতেও নির্ব্বিঘ্নে

সমাধা করিতেছে। ভট্টাচার্য্যের অবস্থা যেমন হউক না কেন, তিনি সে কারণে কখনও নিরানন্দ ছিলেন না। তিনি আপনি গাহিতেন এবং আপনি বাহবা বলিয়া করতালি দিতে জানিতেন। তবে অন্নচিন্তা চমৎকার, সেকারণে সময়ে সময়ে তাঁহাকে বিচলিত হইয়া পড়িতে হইত। বয়োধিক্য বশতঃ প্রতিবাসিগণ তাঁহাকে ঠাকুরদাদা বলিয়া প্রতিমাননা করিতেন। ঠাকুরদার বিষয়-কর্ম্ম যাজকতা, প্রতিবাসিগণের কাহার পিতা-মাতার শ্রাদ্ধ, কাহার বা পুত্র কন্যার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া তিনি সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। এতদ্ভিন্ন কলিকাতায় তাঁহার কয়েক ঘর শিষ্যও ছিল। কিন্তু এরূপে সংসার চালান ক্রমে তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিতে ছিল। ঠাকুরদার প্রতিবাসিগণ পিতা মাতার শ্রাদ্ধশান্তি উঠাইয়া দিয়াছেন বা এক্ষণে তাঁহাদের পুত্র কন্যার বিবাহে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না এরূপ নয়। তবে ঠাকুরদার আয় অপেক্ষা সাংসারিক ব্যয় ক্রমে অধিক হইয়া পড়িতেছিল। ইহার একটী প্রধান কারণ ছিল। এই ঠাকুরদা রথের দুইটী সারথী ছিলেন—প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ। প্রথমা রথখানিকে পূর্ব্বদিকে চালাইতে চাহেন, দ্বিতীয়া রথখানিকে পশ্চিমদিকে চালাইবার জন্য অষ্টপ্রহর কষাঘাত করিতেছেন। সুতরাং এইরূপ বিপরীত টানাটানির মধ্যে পড়িয়া এই পুরাতন রথখানি শীঘ্র জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল এবং ব্যয়রূপ দড়ীটাও টানের চোটে বাড়িয়া যাইতেছিল। ঠাকুরদা সখ করিয়া এই বিচিত্র সারথীদ্বয়ের নাম রাখিয়াছিলেন, বড়রাণী ও ছোটরাণী।

আজ কয়েক দিবস হইতে ঠাকুরদার হাতে একটীও পয়সা নাই। কলিকাতায় দুই এক ঘর শিষ্যবাড়ী বেড়াইয়া আসিবেন মনে মনে করিতেছিলেন। অদ্য আহারাদির পর ঠাকুরদা হাঁকিলেন "কেশ্‌বা।" কেশ্‌বা তাঁহার পুরাতন ভৃত্য এবং পৈত্রিক সম্পত্তির মধ্যে গণ্য ছিল। তাহাকে মাহিনা বলিয়া নগদ কিছু দিতে হইত না, পেট-ভুরান বন্দোবস্ত ছিল। কেশ্‌বা কর্ত্তার আহার কার্য্য সমাধা হইয়াছে জানিয়া হুঁসিয়ার ভৃত্যের ন্যায় একেবারে তামাকু সাজিয়া লইয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুরদা হুঁকাটী হস্তগত করতঃ বলিলেন "কেশব তলপি তাল্‌পা বাঁধিয়া ঠিক করিয়া রাখ, একটু বিষয়-কর্ম্ম উপলক্ষে কলিকাতায় যাইতে হইবে।" কেশবচন্দ্র ঠাকুরদার সহিত কলিকাতায় অনেক বার গিয়াছে, সুতরাং তাহাকে অধিক আর কিছুই বলিতে হইল না। কেশব প্রস্থান করিলে পর ঠাকুরদা তাঁহার অসময়ের বন্ধু হুঁকা মহাশয়ের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পকাল আলাপের পরই ঠাকুরদার চক্ষু দুইটী আপনা হইতে বুজিয়া আসিল। ঠাকুরদা ঝিমাইতে ঝিমাইতে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"না এরকম করে আর সংসার চালান যায় না। দিবা রাত্র নেহি নেহি আর দেহি দেহি শব্দ। পাই কোথায়! রূপচাঁদ আসে কোথা থেকে! কিছু বলবারও যো নেই, তা হলেই বল্‌বে যদি খেতে দিতে পারিবে না তবে মদ্দানি করে বিয়ে ক'রে ছিলে কেন? আরে মোলো, বিয়ে করে ছিলাম কি সখ করে না মদ্দানি করে। ও একটা কার্য্য আমাদের বংশে দোল-দুর্গোৎসবের ন্যায় বরাবর হয়ে

আসছে, বাপ ঠাকুরদা সকলেই সমারোহের সঙ্গে ... গেছেন, আমি এখন হঠাৎ সেটা উঠিয়ে দিলে, লোকে বল্‌বে কুলাঙ্গার জন্মেছিল।" ঠাকুরদা যখন চক্ষু বুজিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময়ে নিঃশব্দে এক যুবতী সেই কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ঠাকুরদার অবস্থা অবলোকন করতঃ শব্দবিহীন হাস্য সহকারে ঠাকুরদার বন্ধু হুঁকা মহাশয়ের মস্তকচ্ছেদ করিলেন, অর্থাৎ হুঁকার মাথা হইতে কলিকাটী নামাইয়া এক গুপ্ত স্থানে রাখিয়া দিলেন। তন্দ্রাভিভূত ঠাকুরদা ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি পূর্ব্ববৎ ঝিমাইতে ঝিমাইতে মধ্যে মধ্যে গুড়ুকে ফুড়ুক টান দিতে লাগিলেন। এই দৃশ্যে যুবতী সশব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন। ঠাকুরদার চমক ভাঙ্গিল, তিনি দেখিলেন এক মনোমোহিনী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসিতে-ছেন। ঠাকুরদা চক্ষু উন্মিলন করিলে যুবতী তাঁহার সমীপ-বর্ত্তীনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এই দুপুর রৌদ্রে মহারাজের কোথায় শুভাগমনের উদ্যোগ হইতেছে।" নবাগতা রমণী আমাদের ঠাকুরদার ছোট রাণী। ছোট রাণী গৌরবর্ণা, অঙ্গ সৌষ্টব প্রশংসনীয়, মুখখানি পদ্মফুলের ন্যায় প্রফুল্ল। ঠাকুরদা সময়ে সময়ে তাঁহাকে গোবরে-পদ্ম বলিয়া ... করিতেন। ছোট রাণীকে দেখিয়া ঠাকুরদা বলিলেন "দেখ আমি, কয়েকদিনের জন্য বিষয়-কর্ম্ম উপলক্ষে কলি-কাতায় যাইতেছি, তোমরা খুব সাবধানে থাকিবে। আর আমার একান্ত মিনতি যে এই কটা দিন তোমরা ঝগড়া ঝাটী করিও না।"

ছোট। একথা আমাকে বলা কেন, আমি কি ঝগড়া করি, আমি কি কুঁদুলি ?

"না—মস্ত ঝগড়া আমি করি, লাগা লাগা লাগানি ডাইনি।"

এই কথা বলিতে বলিতে বড় রাণীও তথায় উপস্থিত হইলেন। অনর্থক একটা কলহের স্থত্রপাত হইতেছে দেখিয়া ঠাকুরদ্দা বলিলেন, "ঝগড়া তোমরা কেহই কর না, ঝগড়া ভূতে করে। এখন শোন, আমি একটু বিষয়-কর্ম্ম উপলক্ষে কয়েক দিনের জন্য বাহিরে যাইতেছি"—

ঠাকুরদার বক্তব্য শেষ হইল না—বড় রাণী বলিলেন, "বিষয়-কর্ম্মে যাও, আর বড়বাড়ী যাও, ঘরে চাল ডাল ফুরাইয়াছে তাহার ব্যবস্থা করে দিয়ে যে চুলোয় ইচ্ছে হয় যাও।"

ঠাকুর। এই কটাদিন চালিয়ে নাও না, তারপর আমি ফিরে এসে সব ব্যবস্থা করে দেব।

বড়। এতো তোমার মক্কেলের বাপের শ্রাদ্ধ নয় যে যা হয় একটা ব্যবস্থা দিয়ে দিলেই হ'লো। চা'ল ফুরিয়েছে আনিয়ে দিতে হ'বে, এর এই ব্যবস্থা। তারপর ছোট রাণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বড় চুপ করে আছিস্ যে, পিণ্ডি চট্‌কান হবে কিসে, ঘরে যে একটাও চা'ল নেই।"

ঠাকুর। আহা গালি দাও কেন ?

বড়। তাইত বড় ব্যথা যে দেখ্‌তে পাই।

ছোট রাণী দেখিলেন বড় রাণী প্রদীপটী বেশ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তিনি তখন প্রদীপের পলিতাটী একটু উস্কাইয়া দিয়া বলিলেন, "তা দিদি উনি যখন বাড়ী থাক্‌বেন না,

তখন আমাদের জন্য অত ভাবনা নেই। আমরা মেয়ে-মানুষ দুটা মুড়ি চিবাইয়া দুদিন চলিয়া যাবে এখন।" ছোট রাণীর কথা শুনিয়া ঠাকুরদা দুই হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করতঃ বলিলেন, "সাধু! সাধু! ছোট রাণী; বড় রাণী দেখ, দেখ পবিত্র দাম্পত্য প্রেম কাহাকে বলে।"

বড় রাণী একেবারে জ্বলিয়া গিয়াছিলেন—বলিলেন,—"দেখাচ্চি, আগে হাঁড়ি ভাঙ্গি তারপর বুঝবে মুড়ি খেয়ে কয়দিন দানপত্তর প্রেম থাকে—মুড়ি খাগী, ঝাঁটা খাগী।"

ঠাকুর। আহা গালি দাও কেন, ঐ তোমার বড় দোষ।

"তাই ত বড় দরদ যে দেখতে পাই, ঝাঁটা কি তোমার পিঠে পড়লো না কি?" ঠাকুরদাকে ছোট রাণীর পক্ষ সমর্থন করিতে দেখিয়া বড় রাণীর ক্রোধাগ্নি ভীমবেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিলেন "মুড়ি খেতে হবে কেন, তুমি বাড়ী থাকবে না, নাগর এসে তোমার ঘরে নগর বসাবে এখন, রসগোল্লা খাওয়াবে, বয়স কাঁচা ভাবনা কি। ডাইনি, ডাইনি, কোথা থেকে একটা ডাইনি এসে আমার সোণার সংসারটা নষ্ট করে দিলে গা।" এই বলিয়া বড় রাণী তখন আঁখি বারি সেচনে আপন ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে বসিলেন। বড় রাণীকে কাঁদিতে দেখিয়া ছোট বলিলেন, "দেখ ঠাকুরদা! দিদি আমাকে ডাইনি বলেছেন।" ঠাকুরদা বলিবার ভঙ্গিমা দেখিয়া বড় রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া ফেলিলেন। আর ঠাকুরদা স্বীয় কর্ণছিদ্রে অঙ্গুলী প্রদান পূর্ব্বক "রাম! রাম!—আবার ঐ কথা" বলিতে বলিতে কেশরাকে সঙ্গে লইয়া বাহির

হইয়া পড়িলেন। পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যকে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই ঠাকুরদা বলিয়া ডাকিত, তাঁহার গোবরে-পদ্মও সময়ে সময়ে ভ্রম ক্রমেই হউক, আর রহস্যচ্ছলেই হউক ঠাকুরদা বলিয়া জিহ্বা কাটিতেন।





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ



বড়রাণীর প্রতিজ্ঞা অম্বা হইতে অধিক দৃঢ়। ভীষ্মবধ করিবেন, এজন্মে না পারেন—পরজন্মে নিশ্চয়ই। বড়রাণী হাঁড়ি ভাঙ্গিলেন, সম্মুখে যাহা পাইলেন তাহা লইয়া ফুটবল খেলিলেন। তারপর ধরাশয্যায় লম্বমানা হইয়া তাঁহার স্বর্গগত পিতা মাতাকে আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ছোটরাণী জানিতেন পেট বেটা বড় নেমকহারাম, সে একদিনও কথা শুনিবে না, সুতরাং তিনি বাজার হইতে চাউল, ডাইল, হাঁড়ি প্রভৃতি আনাইয়া উত্তমরূপে পাক করিলেন। বাটীর সকলকে খাওয়াইলেন, আপনি আহার করিলেন, পরে দিদিকে খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিলেন। দিদির কান্নারস্বর আর তখন বড় একটা শুনা যাইতেছিল না। তখন নাসিকা গর্জ্জন হইতেছিল। ছোটরাণী বলিলেন "দিদি খাবে এসো ভাত জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।" দিদি ভাত অবশ্য খাইবেন, তবে সহজে নয়। সুতরাং ছোটরাণীকে অনেক সাধ্যসাধনা করিতে হইল। দিদি কিছুতেই উঠেন না

দেখিয়া ছোটরাণী বলিলেন "দিদি আজ যা টক দিয়া মাছ রাঁধিয়াছি, একবার খেয়ে দেখ, আমার মাথা খাও! দিদি কোন উত্তর করিলেন না, কিন্তু টক দেওয়া মাঁছের আস্বাদন অনুভব করিবা মাত্র দিদির চোখের জল মুখে নামিল। এইসময়ে ছোটরাণী আপনাপনি বলিলেন—"কিসের শব্দ হইল, ঐ যা বেড়ালে বুঝি সব খেয়ে গেল।" এই বলিয়া ছোটরাণী তাড়াতাড়ি রন্ধনশালার দিকে ছুটিলেন। বড়রাণীও তৎক্ষণাৎ "নেকি নেকি, ভাল ক'রে ঢেকে রাখ্তে হাতে কি মহাব্যাধি হয়েছিল" ইত্যাদি বলিতে বলিতে রন্ধনশালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কিছু দেখিতে না পাইয়া ছোটরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কৈলো ভাত কোথায়?"

"তুমি যে দেরী কল্লে ভাত জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে! এই দেখ গড়িয়ে যাচ্চে।" এই বলিয়া ছোটরাণী খানিকটা জল দেখাইয়া দিলেন। তারপর হাঁড়ি হইতে গরম ভাত বাড়িয়া দিদিকে আহার করাইতে বসিলেন। বড়রাণীর জঠরজ্বালা নিবারণ হইলে, তখন ছোটাণীর রান্নার খুঁত কাটিতে বসিলেন—ঝোলটা নুনে পুড়িয়া গিয়াছে। ডালটায় ধরা গন্ধ ইত্যাদি। অথচ একটী পিপিলিকা ভোজনের খাদ্যসামগ্রী তাঁহার পাতে পড়িয়া রহিল না।

বড়রাণী ছোটকে একটুও দেখিতে পারেন না। মাছকুটিতে বসিয়া অনেকদিন তাঁহার মনে হইয়াছে, অভাগীকে এই সঙ্গে কুটিয়া ফেলি, কিন্তু সেরূপ সুযোগ ঘটে নাই। একে সতীন, তায় ছোটরাণীর গতর ছিল, সংসারের কাজকর্ম্ম

সকলি তিনি করিতেন। আবার ছোটরাণী সুন্দরী। এই সকল কারণে তাঁহার উপর বড়রাণীর বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল ছিল। ছোটরাণীর কিন্তু দিদির প্রতি বিদ্বেষ ভাব দেখা যাইত না, অন্ততঃ বাহিরে জানিতে দিতেন না। বড়রাণী গালাগালি করিতেন, তিনি গায় মাখিতেন না। বড়র সকল ব্যবহার তিনি হাস্যরসে পরিণত করিয়া উড়াইয়া দিতেন। তিনি এইটুকু বুঝিয়াছিলেন যে দুঃখের সংসারে অনর্থক আর দুঃখ বাড়াই কেন।

ঠাকুরদার সংসারে অনেক রকম ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকালে ছোটরাণী গৃহদ্বারে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়া সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিলেন, বড়রাণী যদি তাহা দেখিতে পাইলেন তবে তখনি তিনি আর একঘটী জল লইয়া দ্বারে দ্বারে ছড়া দিয়া আসিলেন এবং জ্বলন্ত প্রদীপ নিবাইয়া পুনরায় জ্বালাইয়া ঘরে ঘরে সন্ধ্যা দেখাইয়া আসিলেন। আবার ছোটরাণী যে দিন একার্য্য না করিলেন সে দিন হয়ত ঠাকুরদার গৃহে গঙ্গাজলের ছড়া পড়িল না, সন্ধ্যাও দেখান হ'লনা। ছোট সন্ধ্যাকালে তিনবার শঙ্খধ্বনি করিলেন, বড়রাণী যাইয়া দশবার শাঁখ বাজাইয়া আসিলেন। এ বিষয়ে কেহ কোন কথা বলিলে বড়রাণী বলিতেন "সংসার আমার, সাংসারীক কোন মঙ্গল কার্য্যে উহার কোনও অধিকার নাই, সুতরাং উহার কার্য্য সকল নামঞ্জুর। বড়রাণীর বিদ্বেষ বাহুল্যতায় পড়িয়া অপর লোককেও অনেক সময়ে অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত। ঘরে শালগ্রাম বিগ্রহ ছিলেন। ছোটরাণী ভোগাদি প্রস্তুত করিয়া ঠাকুর ঘরের দরজা বন্ধ

করিয়া আসিলেন। বড়রাণী ঠাকুর ঘরে একটা তালা বন্ধ করিয়া প্রতিবাসিনীর বাটী বেড়াইতে গেলেন। ঠাকুরটী নারায়ণ পূজা করিতে আসিয়া রৌদ্রে ভাজা হইতে থাকিলেন। বড়রাণী আসিয়া চাবী খুলিয়া দিবেন তবে পূজা হইবে, এই তাঁহার গৃহিণীপনা। একদিবস একজন ভিখারিণী ইহাদের বাটীতে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল, বড়রাণী সে সময়ে বাড়ীতে ছিলেন না, গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন। সে দিন ঘরে চাউল না থাকায়, ছোটরাণী বলিলেন—"ওগো চাউল বাড়ন্ত, আজ ফিরে দেখিতে হবে।" ভিখারিণী আপনাপনি বকিতে বকিতে ফিরিয়া যাইতেছিল—"বাবা আধঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে রহিলাম, তারপর বল্লে কিনা ফিরে দেখ।" ঠিক সেই সময়ে বড়রাণী স্নান করিয়া বাটী ফিরিতে ছিলেন, কথাটা তাঁহার কাণে গেল, তিনি ভিক্ষারিণীর মুখে সমুদয় অবগত হইয়া বলিলেন "বটে, তুমি আমার সঙ্গে এসো। বাটীতে আসিয়া বড়রাণী পা ধুইলেন, কাপড় ছাড়িলেন, একটু ছোলা গুড় মুখে দিয়া জল খাইলেন, তারপর ভিখারিণীর নিকটে যাইয়া বলিলেন—"দেখ ভিক্ষা পাবে, কি না পাবে, এ কথা বলিবার উহার কোনও অধিকার নাই। আমি হ'লেম বাড়ীর কর্ত্রী। এখন আমি তোমায় বলিতেছি যে ভিক্ষা পাবে না, চাউল বাড়ন্ত। উহার ভিক্ষা দেবারও অধিকার নাই, তাড়াবারও অধিকার নাই, বুঝ্‌লে!" ভিখারিণী নির্ব্বাক হইয়া দাড়াইয়া রহিল। সে ভাবিয়াছিল এঁর অতি দয়ার শরীর—সঙ্গে করিয়া বাটী ফিরাইয়া আনিলেন, অবশ্য একমুঠা চাউল দিবেন।

২



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।



জ্যৈষ্ঠ মাস। মধ্যাহ্নকালের রৌদ্র, বাঘের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতেছিল। গো, মহিষ প্রভৃতি চতুষ্পদ জীবগণ সভয়ে বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছে। মুটে মজুর চাষা প্রভৃতি দ্বিপদেরা কর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ করতঃ আত্মরক্ষা করিতেছে। পথিকগণ পথ চলা বন্ধ করিয়া ক্ষণকালের জন্য বটবৃক্ষের শীতল ছায়াতলে বসিয়া শ্রান্তি দূর করিতেছে। এই সময়ে আমাদের ঠাকুরদা গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপর এক বৃক্ষতলে বসিয়া শ্রান্তি দূর করিতেছিলেন। তিনি কলিকাতা হইতে বাটী ফিরিতেছিলেন। রৌদ্র একটু পড়িয়া আসিলেই পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিবেন। কেশব এক কলিকা তামাকু সাজিয়া প্রথমে আপনি উহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া পরে ঠাকুরদার হাতে দিয়া বলিল—"কর্ত্তামশাই ইচ্ছা করুন।" ঠাকুরদা তখন ব্যাগ হইতে একটী পকেট-হুঁকা বাহির করিয়া কলিকা-সুন্দরীকে তদুপরি বসাইয়া সেবা করিতে থাকিলেন। কেশব জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা কর্ত্তা মশাই আজ সাত আট দিন হইতে চলিল, কেবল

পরের বাটিতে ভোজন ও শয়ন চলিতেছে। আপনার বিষয় কর্ম্মটা সারিয়া লউন না, বাড়ী ফিরে যাওয়া যাক। কলিকাতায় মসার উৎপাতে আমার ঘুম হয় না।” কেশবচন্দ্রের শীঘ্র বাটি ফিরিবার একটু বিশেষ কারণও ছিল। উহা পরে জানিতে পারা যাইবে।

ঠাকুরদ্দাকে নীরব দেখিয়া কেশব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, “কর্ত্তা-মশাই আমাকে একটু বিষয়-কর্ম্ম শিখিয়ে দিতে পারেন?”

ঠাকু। বিষয়-কর্ম্ম কাহাকেও শিখাইতে হয় না। তোর বিষয়-কর্ম্ম তুই তো বেশ শিখিয়াছিস্।

কেশ। আজ্ঞে আমি ছোটলোক খেটে খাই, বিষয়-কর্ম্ম আর কবে শিখিলাম।

ঠাকু। কেন বাজারের পয়সা হইতে দুই একটী সরাইয়া কাচার খুঁটে বাঁধিতে বেশ শিখিয়াছিস্। তামাক সাজিতে দিলে তাহা হইতে এটু সরাইয়া গুপ্তস্থানে সঞ্চয় করিতে তো কখন ভুল হয় না।

কেশ। আজ্ঞে আজ্ঞে আপনি কিরূপ আজ্ঞা করিতেছেন। আমি সে রকম স্বভাবের লোক নই। আর এ সকলকে তো চুরি বলে।

ঠাকু। সুধু কথার মার প্যাঁচ রে বাপধন—সভ্যভাষায় যাহাকে বিষয়-কর্ম্ম বলে, অসভ্য ভাষায় তাহাকে চুরি বলে, জুয়াচুরি বলে আরও কত কি বলে। বিষয়-কর্ম্ম অনেক প্রকারের হইয়া থাকে—জেলের বিষয়-কর্ম্ম হ’লো মাছ ধরা; ডাক্তারের বিষয়-কর্ম্ম রোগীর সন্ধান করা, উকীল বাবুদের বিষয়-কর্ম্ম

তদপশ্চাৎ গমন করা, যদি রোগী উইল করেন। আমার মতন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিষয়-কর্ম্ম হ'লো লোকের বাপের শ্রাদ্ধ করান, পুত্র কন্যার বিবাহ দেওয়া, এখন বুঝ্‌লি বিষয়-কর্ম্ম কাহাকে বলে।

কেশ। তা যেন হ'লো, কিন্তু আপনি যে বিষয়-কর্ম্মে যাচ্চি ব'লে বাড়ি থেকে বেরুলেন, তারপর আজ সপ্তাহ কাল পরের অন্ন ধ্বংশ করিতেছি আর নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতেছি, ইহার মধ্যে বিষয়-কর্ম্মটা কি হইল।

ঠাকু। যত রকম বিষয়-কর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে ইহা একটা উৎকৃষ্ট জাতীয় বিষয়-কর্ম্ম জানিবে। আজ সপ্তাহকাল আমরা পরের বাটীতে দুই বেলা চব্যচূষ্য ভোজন করিতেছি, একটা পয়সা ব্যয় নাই, আবার অপরদিকে দেখ আমরা বাটী না থাকায় সেখানেও প্রত্যহ দুই বেলা আমাদের চাউল খরচটা বাঁচিয়া যাইতেছে। তুই ব্যাটাই তো দুই বেলা দুই সের চালের ভাত খাস্। তারপর চরণ বাবুর জুড়িতে আসিয়াছিলাম, চরণ বাবুর জুড়িতে ফিরিতেছি।

রৌদ্র পড়িয়া আসিলে ঠাকুরদা আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। বাটীর নিকট আসিলে ঠাকুরদা সংবাদ পাইলেন তাঁহার প্রতিবাসী হিমালয়চন্দ্রের মাতার নাভীশ্বাস আরম্ভ হইয়াছে। তখন ঠাকুরদা তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্তের যোগাড় করিবার উপদেশ দিয়া আপন গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বৎসরে শতকরা চল্লিশটা প্রায়শ্চিত্ত মামলা ঠাকুরদার হাতে পড়িত। বাটীতে প্রবেশ করিবা মাত্র তাঁহার শ্যালক বৈকুণ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ঠাকুরদা হতাশ ভা

তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে কখন এলে, এই আসিতেছ বোধ হয়?"

শ্যালক। আজ্ঞে না আজ সাত আট দিন আমি এখানে রহিয়াছি, আপনিও গিয়াছেন তাহার আধ ঘণ্টা পরেই আমি আসিয়াছি।

ঠাকুরদা শিরে করাঘাত করিয়া কেশ্‌বার মুখের দিকে একবার তাকাইলেন, তারপর স্বগত বলিলেন "ইহাকেই ব'লে বামুনে কপাল।"

বৈ। আপনি এতদিন কোথায় গিয়াছিলেন?।

ঠাকু। কোথায় আর যাইব, আমার কোথাও যাওয়া হয় নাই।

বৈ। কি বল্‌চেন ভট্টাচার্য্য মশাই! আপনার কথা অনুধাবন করিতে পারিতেছি না।

ঠাকু। তা পারবে কেন। বলি বাপু! তুমি বলিতেছ যে আমিও গিয়াছি আর তুমিও আসিয়াছ, তবে আর আমি গেলুম কোথায়।

ঠাকুরদার হেঁয়ালী বৈকুণ্ঠ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঠাকুরদা বিষণ্ণ মনে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুরদাকে দেখিবামাত্র বড়রাণী বলিলেন, "শীঘ্র কেশ্‌বাকে একটা টাকা দিয়ে দোকানে পাঠিয়ে দাও। বৈকুণ্ঠের জন্য কিছু খাবার লইয়া আসুক। ঘরে কিছুই নাই যে ভাইটাকে একটু জল খেতে দিই।"

ঠাকু। একটু অপেক্ষা করিতে হইবে। একটা বিষয়-কর্ম্ম লাগিবার যোগাড় হ'য়েছে কাজটা লাগলেই খাবার আনিয়ে দিচ্চি।

বড়। কি বিষয়-কর্ম্মটা শুনি আগে।

ঠাকু। হিমালয় মুখোঃর মায়ের নাভীশ্বাস আরম্ভ হয়েছে। প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য এখনি ডাকৃতে আস্‌বে। তাহা হ'লেই আপাততঃ কিছু পাওয়া যাবে। তারপর বড় লোকের মার শ্রাদ্ধে বিলক্ষণ দু পয়সা পাওয়া যাবে, বুঝ্‌লে কি না।

ঠাকুরদার কথা শুনিয়া বড়রাণী ক্রোধে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "হায় মোর দগ্ধ কপাল! মানুষের মা মরিবে, তবে উনি পয়সা পাইবেন, সেই পয়সায় জল খাবার আনাইয়া দিবেন। এই জন্যেই না দুকথা বলিতে হয়।"

ঠাকু। মানুষের মা মরবে না তো আমি কি বলচি যে ঘোড়ার মা মরবে। কতক্ষণের মামলা, ডান হাঁতে মন্ত্র পড়াব, বাম হাতে পয়সা নেবো। বিনা মূল্যে তো আর হিমালয়ের মাকে স্বর্গের সিঁড়ী দেখিয়ে দেবো না। তারপরে বড় লোকের মায়ের শ্রাদ্ধে বেশ দুপয়সা অবশ্য পাওয়া যাবে। এই বারে তোমার শাঁখা বাঁধিয়ে দেবো।

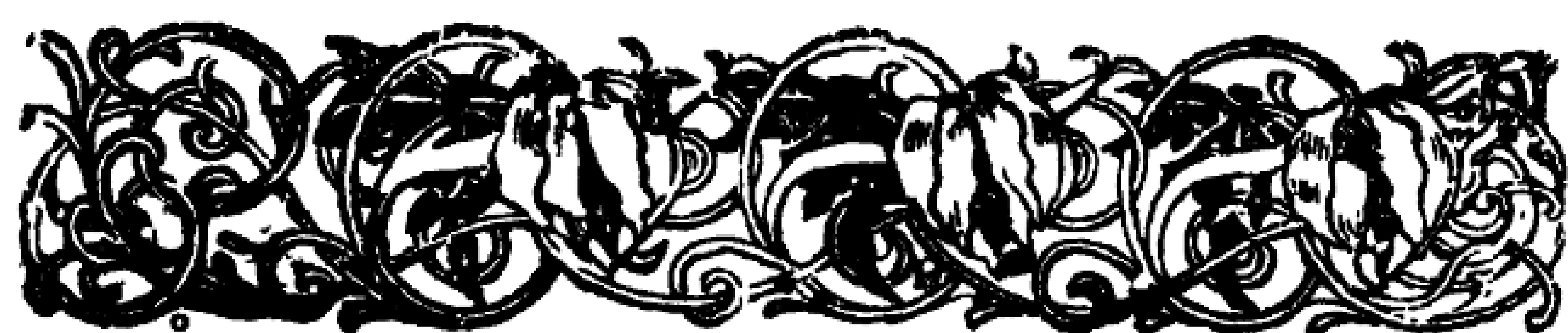
শাখা বাঁধানর কথা শুনিয়া বড় রাণী বল্লেন "তা বেশ তা হ'লে শীঘ্র কাজটা সেরে এসো।" এই সময়ে ছোট রাণী কোণ্ণ হইতে আসিয়া বলিলেন, "আগে আমার কানের দুইটা ইহুদি মাকড়ী গড়াইয়া দিতে হবে।" তখন গহনা-লইয়া দুই রাণীতে যুদ্ধারম্ভ হইল। বড়রাণী ভীমস্বরে ছোট রাণীকে গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

রাজায় রাজায় যুদ্ধের কথা শুনা যায়। গহনা ল' দুই রাণীর যুদ্ধ, বিশেষত এক জনের মা মরিবে, তাহ:

শ্রাদ্ধ হইলে টাকা পাওয়া যাইবে, সেই টাকায় গহনা হইবে এই কারণে যুদ্ধ—বড় একটা শুনা যায় না। কিন্তু ঠাকুরদার সংসারে এই প্রকারে যুদ্ধ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এতক্ষণ দুই রাণীতে বাকযুদ্ধ চলিতেছিল, এক্ষণে বড় রাণী ক্রোধে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া ছোট রাণীকে বাহুযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। দুই রাণী রণসাজে যুদ্ধার্থে আস্ফালন করিতেছেন, মধ্যে ঠাকুরদা দাঁড়াইয়া যুক্তকরে ডাকিতেছেন "মধুসূদন! রক্ষা কর। মধুসূদন! রক্ষা কর।" এই সময়ে হিমালয়ের পুত্র আসিয়া ডাকিল "ঠাকুরদা শীঘ্র আসুন বুঝি বা শেষ হয়ে গেল।"

ঠাকুরদা আহ্লাদে বলিলেন, "আঃ বাঁচালি বাবা—চল্ চল্।"

মানুষ মরায় বুড়ার শকুনির মতন আনন্দ দেখিয়া বড়-রাণী ও ছোট রাণী উভয়েই হাস্য সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইলেন। ঠাকুরদা বলিলেন, "কি কর্ব বড়রাণী এ যে আমার বিষয়-কর্ম্ম।" এই বলিয়া ঠাকুরদা প্রস্থান করিলেন। সে দিনের মতন আবার দুই রাণীতে সন্ধিস্থাপন হইল। হিমালয়ের মার প্রায়শ্চিত্ত হইল—ঠাকুরদা কিছু পাইলেন। পরে শ্রাদ্ধেও বেশ দুপয়সা পাইলেন। কিছু দিনের জন্য আর ঠাকুরদাকে বিষয়-কর্ম্মের চেষ্টায় কলিকাতায় যাইতে হয় নাই।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঠাকুরদার প্রতিবাসী হিমালয় চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কোনও সদাগর-অফিসের বড় বাবু। তাঁহার পিতার পরোলোক প্রাপ্তি হইলে, তাহার মাতা সামান্য মাত্র পাচিকা বৃত্তি অবলম্বন করতঃ ছেলেটাকে মানুষ করিয়া ছিলেন—অন্তত তাঁহার এইরূপ ধারণা ছিল। কিন্তু হিমালয়চন্দ্র আকারে মানুষ হইলেও প্রকারে পশুর অধম ছিলেন। কোন কোন শিশু দেখা যায় দাঁত লইয়া ভূমিষ্ট হয় এবং উহা অত্যন্ত দুর্লক্ষণ। হিমালয় চন্দ্রও সেইরূপ নষ্ট বুদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন, এবং সংসারে আসিয়া অবধি অনেকের অনেক ক্ষতি করিয়াছেন ও মনঃপীড়া দিয়াছেন। এক্ষণে আবার অফিসের বড়-বাবু পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার অধীনস্থ অনাথা কেরাণীদিগের প্রতি স্বীয় ক্ষমতার ব্যভিচার পূর্ণ মাত্রায় করিতে ছিলেন। হিমালয় চন্দ্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল, অধ্যবসায় ছিল। তাহার ফলে শীঘ্র সাংসারিক অবস্থা ফিরাইয়া লইয়া ছিলেন। সাহেবের পদলেহন করিয়া, অপরের অনিষ্ট করিয়া, সামান্য দশ টাকা বেতনের সরকার হইতে হিমালয় এক্ষণে পাঁচশত টাকা মাহিনার বড় বাবু

হইয়াছেন। সাহেবের অনুরোধে হিমালয় করিয়া কোলে সভ্যের খাতায় নাম লিখাইয়া ছিলেন এবং পরে, হিমালয় উন্নতির ইহা একটী তাঁহার পক্ষে প্রধান কারণ
ব্রাহ্ম সভায় নাম লিখান বা খৃষ্টান হওয়া এ দের উদ্ধার পুরাতন হইয়া গিয়াছে—নূতন রকম একটা কিছু কেরাণী তিনি ফ্রিমেসন সভার সভ্যের খাতায় নাম লিখাইলেন। সুতরাং চালচলনও জগতকে একটু নূতন রকম দেখান চাই। হিমালয় প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন, আবার অফিসে বাবুর্চি-হস্তে সাহেবদিগের প্রসাদি বাটীতে চা পান করিয়া আপনাকে এবং পূর্ব্বপুরুষগণকে ধন্য মনে করিতেন। বাটিতে কেহ ভিক্ষা করিতে আসিলে হিমালয় বাবু তাহাকে কুকুর লেলাইয়া দিতেন, বলিতেন ভিক্ষায় প্রশ্রয় দেওয়া পাপ।

হিমালয় চন্দ্র ইংরাজী ভাষায় আপন অভিজ্ঞতার অভিমান করিতেন এবং অধীনস্থ কেরাণী বাবুদিগের নিকট সে বিষয়ে বাহবাও পাইতেন। তাঁহার পারিষদবর্গ আরও তাঁহার এই ভুল ধারণাটীকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। হিমালয় চন্দ্র গ্রাম্যস্কুলের থার্ডক্লাস অবধি পড়িয়া ছিলেন, তারপর খান কয়েক রেনল্ডের নভেল পড়িয়া ছিলেন। ইহাই তাঁহার ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞতার পরিচয়।

হিমালয় বাবু, পাঁচশত টাকা মাহিনা পান. একটা সওদাগর আফিসের বড় বাবু। বিলপাস করা কার্য্য তাঁহার হাতে থাকায় লক্ষ্মীঠাকুরাণী শীঘ্রই তাঁহার নিকট বাঁধা পড়িলেন। বিলপাস করা কার্য্য হাতে থাকা, আর বাড়ীতে টাকার গাছ থাকা—উভয়ই তুল্য মূল্য। নাড়া দিতে পারি-



শব্দে টাকা পড়িতে থাকে। অল্প সময়ের অর্থের সমাগম হওয়ায় পাচিকা-পুত্র চরিত্র কলিকাতার গণিকাগণের পিতা মাতা স্বরূপ .লন, ধরাকে সরা দেখিতে লাগিলেন এবং .ঙ্গ তাঁহার অধীনস্থ কেরাণীদিগের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিতে লাগিলেন। দশ পনের টাকা বেতনের কেরাণীমণ্ডলী নিতান্ত গো বেচারা, তাহাদের নিরুপায়। কিন্তু হিমালয় চন্দ্রের এমনি বদ অভ্যাস যে নিত্য এই গো-হত্যা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। শুয়ে শালিক যেমন রাধাকৃষ্ণ বলিতে শিখিলে দিবারাত্র ঐ এক কথা বলে, হিমালয় বাবুও সেইরূপ এক কথা শিখিয়া ছিলেন, "No work no pay" অর্থাৎ তিনি অধীনস্থ কেরাণীদিগকে কুলি মজুর স্বরূপ দেখিতেন। যে দিন কাজ করিবে সেই দিনের মাহিনা পাইবে।

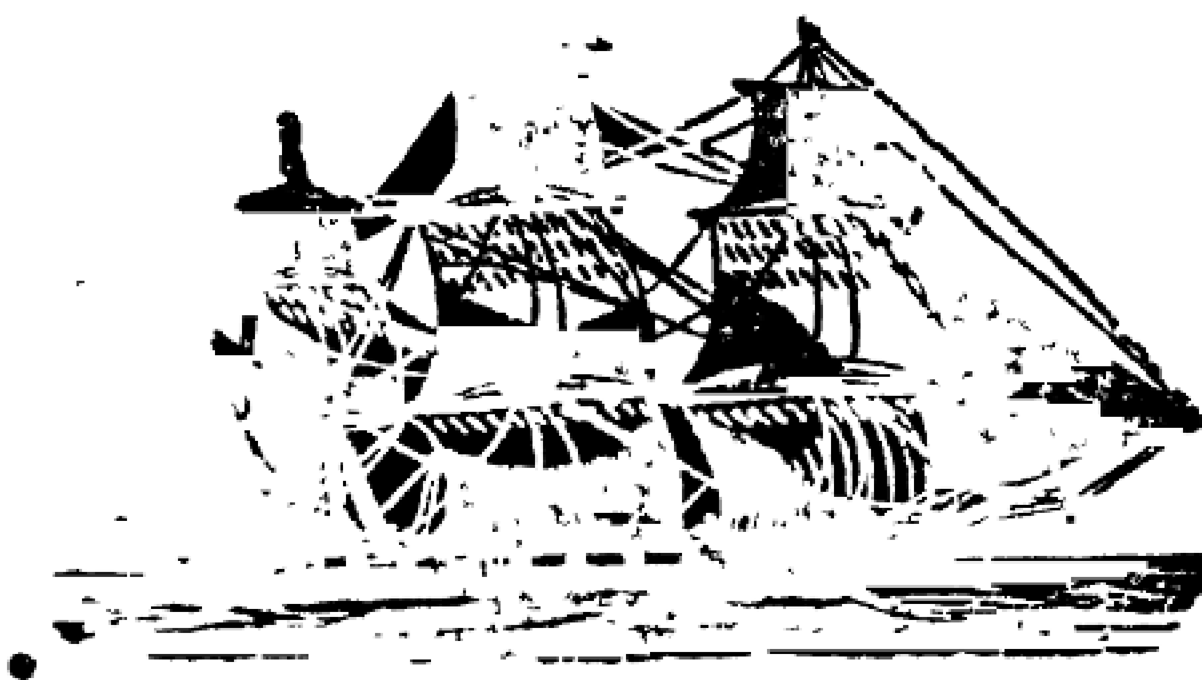
কেহ মাহিনা বাড়াইবার জন্য ধরিলে হিমালয় বলিতেন, "তুমি যাহা পাইতেছ তাহাই যথেষ্ট, তোমার মূল্য একপয়সাও নয়।" তাহাতেও যদি কোন নির্লজ্জ কেরাণী বলিতেন— "আজ্ঞে সংসার চলে না দয়া করিয়া কিছু বাড়াইয়া দিন।" তাহার উত্তরে হিমালয় বলিতেন "এটা দানছত্র নয়,— অফিস।" অনাথা গরীবদিগকে মিষ্ট কথা বলিতে হিমালয়ের গুরুমহাশয় শিক্ষা দেন নাই। তিনি এরূপ পাষণ্ড ছিলেন যে বাপ মায়ের শ্রাদ্ধের জন্য ছুটি প্রার্থনা করিলে মঞ্জুর করিতেন না। বলিতেন—"এখন ক্লোজিং টাইম, ছুটি পাবে না—শ্রাদ্ধ তখন একটা রবিবার দেখে সেরে নিও।" হিমালয়ের এত

স্পর্দ্ধা কেন? সাহেব আজ তাঁহাকে আদর করিয়া কোলে বসাইয়াছে। কাল আবার পদাঘাতে দূর করিতে পারে, হিমালয় তাহা ভাবিতেন না।

হায় হতভাগ্য কেরাণী এ বিপদে কে তোমাদের উদ্ধার করিবে জানি না। কোন্ পাপ করিলে বাটখারা কেরাণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়, প্রত্যেক লোকের সে তত্ত্বানুসন্ধান করা উচিত। কথায় বলে "চাকুরী, গুখুরী, করিতো ঝকমারী, না করি তবে অনাহারে সগোষ্ঠী প্রাণে মরি।" এদিকে বাক্য যন্ত্রণা, অপমান, লাঞ্ছনা, অপরদিকে সংসার চলে না কেবল দেনা বৃদ্ধি।

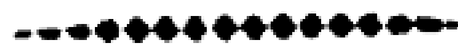
কথিত আছে কেরাণীগণ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত। ইহারা আপন উদর পরিচালনের জন্য ব্রহ্মার বাহন হংস বংশের পক্ষ উৎপাটন করিতে থাকিলে, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া একদিবস সমবেত হংসমণ্ডলী ব্রহ্মার নিকট কেরাণী কর্ত্তৃক তাহাদের নির্য্যাতম জ্ঞাপন করিল। ব্রহ্মা স্বীয় বাহন হংসরাজ বংশকে কেরাণী কর্ত্তৃক ঈদৃশ লাঞ্ছিত হইতে শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন—"যেমন হতভাগ্য কেরাণীগণ উদর পরিচালনের জন্য আমার বাহন বংশের নিগ্রহ করিয়াছে, তেমনি তাহারা যত টাকাই উপার্জ্জন করুক না কেন তাহাদের ডাইনে আনিতে বাঁয়ে কুলাইবে না, মাসের শেষে অনশনে দিন যাইবে এবং তাহাদের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক দিবারাত্র লাঞ্ছিত হইতে হইবে।" এইরূপ ভীষণ অভিশাপের কথা শ্রবণ করিয়া তখন সমগ্র কেরাণীজীবী ছুটিয়া আসিয়া ব্রহ্মার পদতলে লুটাইয়া পড়িল এবং বলিল,

"প্রভু রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমাদের সবংশে ধনে প্রাণে মারিও না।" অনেক স্তবস্তুতি করিবার পর ব্রহ্মার ক্রোধের উপশম হইলে, তিনি বলিলেন যে আমার অভিশাপ ব্যর্থ হইবার নহে, তবে তোমাদের উপায় করিয়া দিতেছি। তোমরা আমার কৃপায় মুদির দোকানে ধারে জিনিষ ক্রয় করিতে পারিবে। তোমাদের অবস্থা যেমন হউক না কেন মুদিগণ তাহাদের পুরুষানুক্রমে তোমাদের ধারে জিনিষ দিতে বাধ্য রহিল, নতুবা তাহাদের দোকান চলিবে না। আর বড়বাবুকে মাঝে মাঝে পূজা পাঠাইবে, তাহা হইলে আর আফিসে লাঞ্ছিত হইতে হইবে না। কিন্তু সাবধান! ভবিষ্যতে আর কখনও হংসরাজ বংশের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিওনা। সেই অবধি কেরাণীগণ ষ্টীলপেন ব্যবহারে উদর পরিচালন করিতেছেন।





পঞ্চম পরিচ্ছেদ।



বর্ষাকাল। রাত্রে বৃষ্টি নামিয়াছে, বেলা সাতটা বাজিতে চলিল তথাপি বৃষ্টির বিরাম নাই। কলিকাতা শ্যামবাজারের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে একখানি ক্ষুদ্র অট্টালিকার এক কক্ষে বসিয়া নগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাহার পঞ্চমবর্ষীয় পুত্রের বর্ণপরিচয় কতদুর শিক্ষা হইল, তাহাই পরীক্ষা করিতেছিলেন। পিতা এটা কি, সেটা কি—যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন পুত্র তাহা ঠিক ঠিক বলিতেছিল, দেখিয়া নগেন্দ্র আনন্দচিত্তে পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন। পুত্র বলিল "বাবা একটা ছোট "ক" দেখিবে"। সেই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় একটী ছোট অক্ষরে "কলিকাতা" লেখা ছিল বালক সেই কলিকাতার ক'টী দেখাইয়া বলিল, "এই দেখ বাবা একটা কতটুকু "ক"। নগেন্দ্র পুনরায় পুত্রের মুখচুম্বন করতঃ বলিলেন "বা তাহা হইলে তুমি "ক" "খ" বেশ চিনিয়াছ।"

পুত্র। আমি এবারে দ্বিতীয় ভাগ পড়িব মা বলিয়াছেন।

এইসময়ে শিশিরসিক্ত কুসুমের ন্যায় একরমণী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং পুত্রকে বলিলেন "মার নামে ওঁর

কাছে কি লাগান হ'চ্চে। নগেন্দ্র দেখিলেন প্রভাবতী। প্রভাবতীর বসন আর্দ্র, মস্তক হইতে জল গড়াইয়া পড়িতেছে, প্রভাবতী শীতে কাঁপিতেছেন। সকাল হইতে বৃষ্টিতে ভিজিয়া প্রভাবতী বাসি পাঠ সমাধা করিয়া আসিলেন। প্রভাবতীর অবস্থা দেখিয়া নগেন্দ্রের প্রাণে বড় বাজিল। তিনি একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ বলিলেন "প্রভা, কর্ম্মফল কাহাকে বলে জান ?"

প্র। হাঁ—জানি, অনেকটা পানফলের মতন, না।

ন। প্রভা! তুমি কেমন সর্ব্বদা হাস্যময়ী, আমি কেন তোমার মতন চেষ্টা করিয়াও হইতে পারিনা।

প্র। আমার মতন হইয়া কাজ নাই।

ন। প্রভা! জানি আমি তোমার লুকোচুরি খেলা। জানি আমি তোমার ঐ হাসির অন্তরালে কি হাহাকার লুকান আছে ?

নগেন্দ্রর কথাগুলি প্রভাবতীর কর্ণগোচর হইল কিনা তাহা ঠিক বুঝা গেলনা। কারণ প্রভাবতী তখন একখানি শুষ্কবস্ত্র সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত ছিলেন। বস্ত্রখানি হস্তগত হইলে প্রভাবতী সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন এবং ক্ষণ-কালের মধ্যে শুষ্কবস্ত্র খানি পরিধানপূর্ব্বক বসনাঞ্চলে স্বীয় মুখচন্দ্রখানি মার্জ্জনা করিতে করিতে পুনরায় নগেন্দ্রর নিকটে আসিয়া বলিলেন "কি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে বল দেখি। তোমার কথাগুলার টকাটক উত্তর দিয়া আমি আবার রাঁধিতে যাইব।" প্রভাবতীর কথায় নগেন্দ্র একটু হাসিয়া বলিলেন, "মাথামুণ্ড কি আর বলিব, এই কর্ম্মফলের

কথা বলিতেছিলাম—উহার কোন মীমাংসা করিতে পারা যায় না। এই দেখ না, তুমি সকাল হইতে বৃষ্টিতে ভিজিয়া বাসি পাঠ করিয়া মরিতেছ, আর একজন কেমন প্রভাতের প্রজাপতিটী সাজিয়া সোহাগে হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছে। একজন চলিতে পারিতেছেনা, পা টানিয়া টানিয়া মৃতপ্রায় হইয়াও চলিতে হইতেছে, আর একজন কেমন গাড়ি চড়িয়া আরামের ক্রোড়ে বসিয়া যাইতেছে। এরূপ হয় কেন ?"

প্র। এই কথা! ইহার মীমাংসা করিতে পার নাই—যে ব্যক্তি গাড়ি চড়িয়া যাইতেছে, সে চলিতে অসমর্থ, তাই গাড়ি চড়িয়া যাইতেছে।

ন। বেশ বলিয়াছ, মুখের মতন জবাব দিয়াছ।

প্র। কেন, ঠিক বলি নাই ?।

ন। অসমর্থ তোমায় কে বলিল, আমি কোন রুগ্ন বা বুড়া ব্যক্তির কথা বলিতেছি না। দিব্য যুবা পুরুষ, একটা ছাগল একলা আহার করে, এমন লোক চলিতে অসমর্থ হইল কি জন্য ?

প্র। যে কোন কারণে হউক ঐ ব্যক্তি চলিতে অসমর্থ বুঝিতে হইবে। রুগ্ন বা বুড়া বলিয়া অসমর্থ না হইতে পারে। হয়ত ঐ ব্যক্তি আত্মাভিমানি, আমি বড়লোক আমি কি চলিয়া যাইতে পারি, এই অভিমানে ঐ ব্যক্তি চলিতে অসমর্থ হইয়াছে!

প্রভাবতীর কথায় নগেন্দ্র একটু হাসিলেন। প্রভাবতী পুনরায় বলিলেন "দেখ আমার মনে হয় কর্ম্মফল, সুখদুঃখ এসকল কিছুই সত্য নয়। সকলই ছায়াবাজীর ন্যায়। বালিকা বয়সে পুতুল খেলিতাম। চারিটী পুতুল লইয়া খেলিতে বসিলাম, তন্মধ্যে দুইটী পুতুলকে মেয়ে জামাই

করিয়া পালঙ্কের উপর বসাইলাম, অপর দুইটীকে চাকরাণী সাজাইয়া মেয়ে জামাইয়ের সেবায় নিযুক্ত করিলাম। এখন বল দেখি যাহাদের চাকরাণী করিলাম, তাহারা আমার নিকট কি কোন অপরাধ করিয়াছিল? তাহা নয়, আমার পুতুল খেলা খেলিতে হইলে মেয়ে জামাইও প্রয়োজন, দাস দাসীরও প্রয়োজন। সুতরাং আমাকে উভয় রকমই সাজাইতে হইল। সেইরূপ তাঁহার খেলা খেলিতে বসিয়া যাহা তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছে, তিনি তাঁহার পুতুলদিগকে সেইপ্রকার সাজাইয়াছেন।"

নগে। প্রভাবতী! তোমার পুতুলে এবং তাঁহার পুতুলে কিছু প্রভেদ আছে। তোমার পুতুলগুলি অচেতন। তাঁহার পুতুলগুলি সচেতন এবং তাহাদের মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে। জ্ঞান বিকাশে সুখ দুঃখ অনুভব শক্তি হইয়াছে, এগুলিও তাঁহার খেলা বুঝিতে হইবে। এই পরিদৃশ্যমান জগতে আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি বা করিতেছি, সে সমুদয় যদি মিথ্যা হয়, তবে সত্য কি?

উনান জ্বলিয়া যাইতেছে দেখিয়া প্রভাবতী তর্কের শীঘ্র মীমাংসা করিয়া ফেলিলেন। বলিলেন "সত্য তুমি, আর আমি, আর আমার ভাতের হাঁড়ি। প্রভাবতী আপন কার্য্যে চলিয়া গেলেন নগেন্দ্রও অফিস যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আজ নগেন্দ্রর একাদশী সুতরাং সকালে কুঠিওয়ালার ভাতের তাড়া ছিল না, সেইজন্য প্রভাবতী সকালে স্বামীর সহিত একটু গল্প করিতে অবসর পাইয়াছিলেন।

নগেন্দ্র সংসারে সকলই পাইয়াছিলেন। সংসারের সার রমণীরত্ন, প্রভাবতীকে পত্নীরূপে পাইয়াছিলেন। প্রেমপুত্তলি পুত্র-কন্যা পাইয়াছিলেন—পান নাই কেবল পৈত্রিক কিছু ধনসম্পত্তি। নগেন্দ্র হিমালয় চন্দ্রের অফিসে ত্রিশ টাকা বেতনে কর্ম্ম করেন। তাহাতে কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। নগেন্দ্র যুবা পুরুষ, সংসারে তাঁহার কত আশা, কত উচ্চ অভিলাষ। দরিদ্রতা প্রযুক্ত সকলই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইতেছে। নগেন্দ্রের পুত্রটী সুন্দর, একটী ভাল জামা না পরাইয়া লোকালয় বাহির করা যায় না—অর্থাভাবে সাধ পূর্ণ হইল না। নগেন্দ্রের কন্যাটী বড় সুন্দরী একগাছি হার গলায় না দিয়া কি নিমন্ত্রণ বাটী লইয়া যাওয়া যায়?—ইচ্ছা পূর্ণ হইল না, ভবিষ্যতে যে হইবে তাহারও সম্ভাবনা নাই। ভরসা চাকুরি, তাহাও দৈত্যরাজ হিমালয় চন্দ্রের অধীনে। এই সকল কারণে নগেন্দ্র দিনে দিনে মুহ্যমান হইয়া পড়িতেছিলেন।

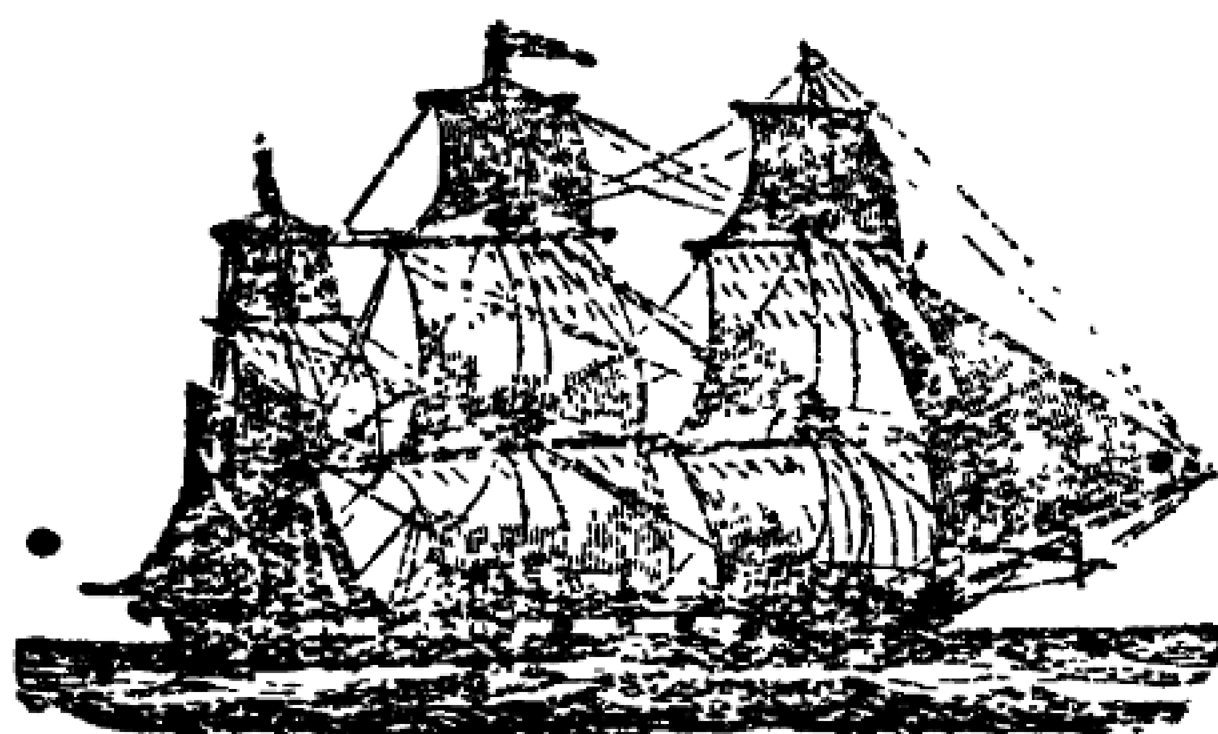
প্রভাবতী সর্ব্বদা হাস্যময়ী থাকিলেও নগেন্দ্র বুঝিতে পারিতেন, যে সে হাসির অন্তরালে কি ব্যথা লুকাইত আছে। প্রদীপ জ্বালিলে অন্ধকার দূর হয়, কিন্তু প্রদীপে তৈলাভাব হইলে ক্ষণেকমাত্র আলোকের পর আবার অন্ধকার গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইতে হয়। স্বামীকে প্রফুল্লচিত্ত রাখিতে প্রভাবতীর চেষ্টাও সেইরূপ কার্য্য করিত মাত্র। দরিদ্রতা প্রযুক্ত নগেন্দ্রের আনন্দ-প্রদীপে তৈলাভাব হইয়াছিল—প্রভাবতী কি করিবেন।

প্রভাবতীর গৃহিণীপনা অতি প্রশংসনীয় ছিল। ঐ অল্প

আয়ের মধ্যে তিনি এরূপ গুছাইয়া চালাইতেন, যে নগেন্দ্রকে সংসার চলে না বলিয়া ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত না। প্রভাবতী আপন হস্তে সংসারের সকল কার্য্য করিতেন—সকল বিষয় তাঁহার দৃষ্টি ছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর নগেন্দ্র অফিস হইতে বাটী আসিলে প্রভাবতী কথা প্রসঙ্গে জানিয়া লইতেন, কাল তাঁহার কোন্ কোন্ কার্য্য আছে। যদি জানিলেন যে কাল নগেন্দ্র কোন স্থানে যাইবেন, তবে ধোপদস্ত কাপড় চাদর প্রভৃতি বাহির করিয়া রাখিতেন—পিরাণটীতে বোতাম পরাইয়া রাখিতেন। যদি জানিলেন যে কাল নগেন্দ্রের কিছু লেখা পড়ার কার্য্য আছে, তবে মসীপাত্র, লেখনী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন একখানি ব্লটিং পেপারও রাখিতে ভুলিতেন না। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য গুলি অতি আনন্দদায়ক।

নগেন্দ্রের এখনও সংসারে অভিজ্ঞতা পরিপক্ক হয় নাই। তিনি দরিদ্র বলিয়া দুঃখিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার যে একখানি অমূল্য কোহিনুর রত্ন ছিল, তাহার সঠিক মূল্য তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিতেন অর্থের সমাগম হইলেই তাঁহার সুখ হইবে। কিন্তু শুধু অর্থে সুখ হয় না। হিন্দু বিশেষতঃ বাঙ্গালি, যিনি যেরূপ পত্নীলাভ করিয়াছেন, তিনি সংসারে সেইরূপ সুখী হইতে পারিয়াছেন। নতুবা অর্থ দেখিয়া বাঙ্গালীর সুখ দুঃখ নির্ণয় করা যায় না। যাঁহার ভার্য্যা লক্ষ্মীরূপিণী নহেন, তিনি দরিদ্র হউন অথবা ধনী হউন তাঁহার সুখশান্তি সুদূর-পরাহত। যেমন সোণার পাথর বাটী হয় না, সেইরূপ পত্নী লক্ষ্মীরূপিণী না হইলে

সুখ-শান্তি হইতে পারে না। অনেক মধ্যবিৎ গৃহস্থ ও ধনী ব্যক্তির সংসারে দেখা যায়, অর্থের অভাব নাই, লোক জন, দাস দাসী, আত্মীয় কুটুম্ব কিছুরই অভাব নাই। এক উপযুক্ত গৃহিণী অভাবে হাহাকার ব্যাপার, সংসারে বিষম বিশৃঙ্খলা। আমাদের মধ্যে শতকরা এক জনের পত্নীভাগ্য, অবশিষ্ট পেত্নীভাগ্য।





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বেলা তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। নগেন্দ্র অফিসে বসিয়া আপনার কার্য্য করিতেছেন। অপর অপর কেরাণী বাবুরা, কেহবা কাজ করিতেছেন, কেহবা একটু গল্প করিতেছেন, আবার কেহ তাঁহার শ্রোতা হইয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতেছেন। এই সময়ে হিমালয় বাবু আপন কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। হিমালয়চন্দ্র বেলা তিনটার পর "চা" পান করিয়া প্রত্যহ একবার করিয়া পুলিশ কর্ম্মচারীর ন্যায় রোঁদে বাহির হইতেন—উদ্দেশ্য তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ কে কি করিতেছেন, ইহাই দেখা। দূরে হিমালয বাবুকে আসিতে দেখিয়া ছোকরার দল পরস্পরকে সাবধান করিয়া দিল "ওহে সহধর্ম্মিণীর সহোদর আসিতেছে।" প্রবীণ কেরাণীগণ "ওহে সন্দেশখেগোর ব্যেটা আসিতেছে" বলিয়া যে যাহার কাগজ পত্র গুছাইয়া বসিলেন। হিমালয় বাবু স্বীয় মার্জ্জারি বিনিন্দিত গুম্ফগুচ্ছে গোচড় প্রদান করিতে করিতে কেরাণী সভায় উদয় হইলেন। শ্যামাচরণ নামে এক ব্যক্তি ঘাড় হেট করিয়া "সাত আর সাতে চৌদ্দ" যোগ দিতে ছিলেন, হিমালয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "শ্যামবাবু আপনার বয়স কত হইল?"

শ্যা। আজ্ঞে এই পঁয়তালিশ ছচল্লিস হবে আর কি।

হি। আপনি চশমা লয়েন নাই কেন?

শ্যা। আজ্ঞে এখনও দরকার হয় নাই।

হি। এ কথা একটুও বিশ্বাসযোগ্য নয়। ভাল আপনি প্রত্যহ কয় সের দুগ্ধ খাইয়া থাকেন, কি মৎস্যের মুড়া খান, রুই না কাতলা?।

শ্যা। আজ্ঞে দুগ্ধ আর কোথায় পাইব যে খাইব চল্লিশটী টাকা মাহিনা পাই, ডাল ভাত খাইতে কুলায় না, ছেলেপুলেরাই একটু দুধ পায় না, তবে মাছের মুড়াটা প্রতি গ্রাসেই খাইয়া থাকি বটে।

হি। তবে আপনি এরূপ বেআইনি কথা বলিতেছিলেন কেন, যে চশমার দরকার হয় না। দুধ খান না মাছ খান না তত্রাচ আপনি বিনা চশমায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে দেখিতে পান, ইহার বাঙ্গালা মানে আপনি কাজে ফাঁকি দেন। আপনাকে এক সপ্তাহের সময় দিলাম ইহার মধ্যে একখানি চশমা সংগ্রহ করিবেন, নতুবা আমি সাহেবকে জানাইতে বাধ্য হইব।

শ্যাম বাবুকে উপরোক্তরূপে শাসন করিয়া হিমালয়বাবু তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একস্থানে হিমালয় দেখিলেন, দুইখানি আসন শূন্য রহিয়াছে। তখনি ডাকিলেন "রাম বাবু—এ দুইটা টেবিলে লোক নাই কেন?"

রাম। আজ্ঞে তারাপদর মার বড় অসুখ, তাই আজ সে আসিতে পারে নাই। আর শশীবাবু কাল অফিস থেকেই জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে বাটী গিয়াছেন।

হি। উহাদের এ্যাট্‌ওয়ান্স (At once) আসিতে লিখিয়া দিন, না পারে—জবাব দিন। আমরা ডাক্তার নই বা এটা হাঁসপাতাল নয়। কাহার জর হইল, কাহার মা মরিল, তাহা আমাদের দেখিবার প্রয়োজন নাই।

তারাপদ ও শশীবাবুর জবাবের হুকুম দিয়া, হিমালয়বাবু তথা হইতে আমাদের নগেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নগেন্দ্রের শুষ্কমুখ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমায় শুষ্ক দেখ্‌ছি কেন হে"।

না। আজ্ঞে আজ একাদশী।

হিমালয়চন্দ্র তৎক্ষণাৎ Section in Charge বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন,—"I see the health of the Department is very unsatisfactory আপনি এ সমস্ত আমায় রিপোর্ট করেন না।" In charge মহাশয় কাঁপিতে কাঁপিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ্ঞে কি হ'য়েছে।"

হি। Want of faith, নেমকহারামি কাজ হইতেছে। কোম্পানি মাহিনা দেয় তাহার কার্য্যের জন্য। ঐ শ্যামাচরণ বাবু পঞ্চাশ বৎসর বয়সে চশমা না লইয়া কোম্পানীর কাজ চালাইয়া দিতেছেন। ঐ দুই ব্যক্তি নির্ব্বিবাদে অফিস কামাই করিতেছেন। এই এক বাবু একাদশী ক'রে অফিস আসিয়াছেন। এ সকল কত দূর অন্যায় বলুন দেখি? In charge মহাশয় অনায়াসে বলিলেন,—"আজ্ঞে তাই ত বড় অন্যায় দেখিতেছি।"

নগেন্দ্র বলিলেন,—"একাদশী করিয়াছি ইহাতে কি অন্যায় হইল, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি সকাল হইতে

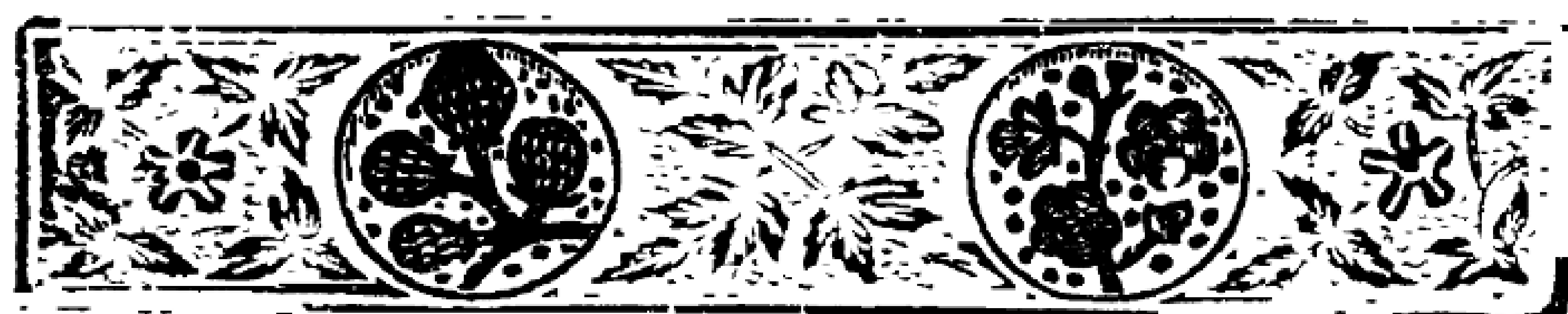
কোম্পানির কার্য্য করিতেছি, আপনি যাহাকে ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।"

হি। কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই, একটু Common sense মাত্র থাকিলেই হইল। একটা লোক আহারাদি করিয়া সুস্থ শরীরে যে পরিমাণে কাজ করিতে পারে, অনাহারে থাকিয়া সে ব্যক্তি সে পরিমাণে কাজ করিতে পারে না-- তুমি আজ হাপ ডে পে পাইবে (Half-day pay).

ন। আজ্ঞে—

হি। আমি কোনও কথা শুনিতে চাহি না।

হিমালয়বাবুর ন্যায় শাস্ত্রে বুৎপত্তি নগেন্দ্রকে ধৈর্য্যচ্যুত করিয়া তুলিল। নগেন্দ্র দক্ষিণ হস্তে একগাছি রুলার বাগাইয়া ধরিলেন। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে নগেন্দ্র দেখিলেন একখানি চন্দ্রবদন তাঁহার হৃদয়াকাশে প্রভাসিত হইয়া বলিতেছে "কর কি, কর কি দেব! তোমার মণি তোমার ফণি কোথায় দাঁড়াইবে? দুইটী অন্নের জন্য কাহার দুয়ারে যাইবে! এ অধিনীর মুখের প্রতি চাহিয়া ক্রোধ সম্বরণ কর। পাপিষ্ঠকে মার্জ্জনা কর।" নগেন্দ্র সে মুখ চিনিলেন—মুখ প্রভাবতীর। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নগেন্দ্র হাতের রুলার নামাইয়া হতাশভাবে আপন আসনে বসিয়া পড়িলেন। কেহ কেহ বলিলেন রুলার তুলিয়াছিলে যখন, একঘা বসাইয়া দিলেই হ'তো। তোমার এ দিকেও গিয়াছে ও দিকেও যাইত। এইরূপে অনেকে অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু নগেন্দ্রর সে সময় মাথা ঘুরিতেছিল, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন।



সপ্তম পরিচ্ছেদ।



কলিকাতার এক অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে "জনক জননী" মাসিক পত্রিকা কার্য্যালয় অবস্থিত। হিমালয়বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুরেশ বাবু উক্ত সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সত্ত্বাধিকারী। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সুরেশচন্দ্র নব্য সম্প্রদায়ের সভ্যটী সাজিয়া অর্থাৎ পরিধানে হ্যাটকোট, চোখে সোণার ফ্রেমে আঁটা চশমা, হাতে রিষ্ট ওয়াচ, মুখে চুরোট চিল—তিনি কার্য্যালয়ে গমন করিতেছিলেন। পথে এক পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা তাঁহাকে দেখিয়া ডাকিল "দিদি শীঘ্র আয়, দেখে যা, সাহেব যাচ্চে।" বালিকার দিদির বয়স অনুমান আট বৎসর হইবে। অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা সাহেব দেখিবার আশায় উৎফুল্লচিত্তে দ্রুতগতি কনিষ্ঠার সমীপে উপস্থিত হইল, কিন্তু সাহেব দেখিয়া ভগ্নোৎসাহে বলিল "পোড়া কপাল, ঐ তোমার সাহেব? ও যে বাঙ্গালী, সাহেব সেজে অমনি করে যাচ্চে।"

সুরেশচন্দ্র প্রথমে পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকার কথায় আপনাকে মনে মনে ধন্য গণিতেছিলেন। কিন্তু অষ্টম বর্ষীয়া বালিকার কথায় তাঁহার ক্রোধের উদ্রেক হইল। ভাবিলেন বালিকাকে

তাহার ধৃষ্টতার জন্য কিছু শিক্ষা দিবেন। কিন্তু তিনি তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই তাহারা বাটির মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। অগত্যা ক্ষুণ্ণমনে সুরেশবাবু আপন কার্য্যালয়াভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে পুনরায় এক দাসী তাহার ক্রোড়স্থ ক্রন্দনশীল শিশুকে ভুলাইবার জন্য সুরেশ বাবুকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশে দেখাইয়া বলিল "ঐ দেখ্ বহুরূপী যাচ্ছে।" দাসীর কথায় সুরেশচন্দ্র ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। তিনি দ্রুতগতি সে পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথাবলম্বনে কার্য্যালয়াভি-মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বালিকা ও দাসীর কথা গুলি তাঁহার মনে বড়ই পীড়া উৎপাদন করিতে লাগিল। ভবিষ্যতে হ্যাটকোট পরিত্যাগের জন্য তিনি কৃত-সঙ্কল্প হই-লেন। তিনি কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া হ্যাটকোট খুলিয়া বলিলেন "প্রিয় হ্যাটকোট আজ থেকে তোমাদের "মা" বলে ত্যাগ কল্লেম—উঃ কি অপমানের কথা।" পরে একখানি আরাম কেদারায় উপবিষ্ট হইয়া দরওয়ানকে আজ্ঞা করিলেন "কম্পো-জিটর রামদয়ালবাবুকে সেলাম দে।" রামদয়াল বাবু আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার হাতের কাজ সব শেষ হইয়াছে, আজ ফর্ম্মা চড়িবে তো?"

রাম। আজ্ঞে না, শেষকালের ফর্ম্মাটার একটু মেটার (Matter) কম পড়িতেছে। আমি আপনার আসার অপেক্ষা করিতেছিলাম। ফর্ম্মা কমপ্লিট হয় নাই।

রামদয়ালের বক্তব্য শেষ হইতে না হইতেই সুরেশচন্দ্র "ড্যাম্ ইট" (Dam it) বলিয়া ভূমিতে বুটাঘাত করিলেন। পরে চেয়ারের উপর হেলিয়া পড়িয়া বলিলেন "পত্রিকা বাহির

করিতে দুইদিন বিলম্ব হইলে গ্রাহকগণ একেবারে মার মার করিয়া উঠেন। কিন্তু সংবাদপত্র সময়ে বাহির করা যে কি কঠিন কর্ম্ম, তাহা তাঁহাদের বোধগম্য হয় না। এই যে ইলেভেনথ আওয়ারে (Eleventh hour) সংবাদ পাইলাম, মেটার কম পড়িতেছে। আমি এখন মেটার পাই কোথায়? একি চাল ডাল যে নেই বল্লেই অমনি চিঠি লিখে দোকান হইতে আনিয়া দিলুম!"

অতঃপর সুরেশবাবু কাগজ কলম লইয়া বসিলেন। দুই একখান কাগজে দুই একছত্র লিখিলেন, কিন্তু মনঃপুত না হওয়ায় ছিড়িয়া ফেলিলেন। তখন কম্পোজিটর বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন কতখানি মেটার (Matter) কম পড়িতেছে?

"আজ্ঞে বেসি নয় এই লাইন দশবার কম হইতেছে"। সুরেশবাবু তখন চিন্তামগ্ন হইলেন। কিয়ৎকাল গম্ভীরবদনে চিন্তা করিয়া সুরেশবাবু এইপ্রকার লিখিলেন:—

সাবধান! সাবধান!

"আমরা বিশ্বস্ত সুত্রে অবগত হইলাম যে শাপিকা বাঁধাঘাটের নিকট এক মনুষ্যভোজী ব্যাঘ্র বাহির হইয়া ভীষণ উৎপাত করিতেছে। মানুষ, গরু, বাছুর প্রভৃতি সংহার করিয়া উদরসাৎ করিতেছে। জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিলাম"—

উপরোক্ত সংবাদটী লিখিয়া সুরেশবাবু রামলালের হাতে দিলেন। রামলাল উহা লইয়া কম্পোজ করিতে চলিয়া গেল।

এই সময়ে পোষ্ট আফিসের পিয়ন আসিয়া কতকগুলি চিঠি দিয়া গেল সুরেশ বাবু চিঠিগুলি খুলিয়া দেখিতে

লাগিলেন। উহার মধ্যে একখানি চিঠি খুলিয়া পাঠ করিতে করিতে বলিলেন—“এ ব্যেটা জুয়াচোর, টাকা পাঠাইবার নাম্ নাই, কেবল লিখিতেছেন আমার বিজ্ঞাপনটী বন্ধ করিবেন না, এবারের সংখ্যায় যেন বাহির হয়” Dam it. পরে দ্বিতীয় পত্রখানি হাতে লইয়া সুরেশ বাবু আহ্লাদে আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—“Ah hcre my darling এই যে ইনি এবারের প্রবন্ধগুলি পাঠাইয়া দিয়াছেন।”

তারপর সুরেশবাবু বারে বারে সেই প্রবন্ধটী পাঠ করিতে লাগিলেন এবং লেখকের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—যে ভাল তাহার সকলি ভাল দেখা যায়। আহা, ইহাদের লেখা গুলি কি সুন্দর, যেন মুক্তা ছড়াইয়া দিয়াছে। কবিতাটীর কি গভীর ভাব, কি হৃদয়স্পর্শী। সর্ব্বোপরি লেখকের নামটী কি সুন্দর—শ্রীমতী ষোড়শীবালা দেবী—মরি মরি, কি সুন্দর নাম। বয়সও বোধ হয় ঐ প্রকার হইবে। যাহার নাম এত সুন্দর, যাহার কল্পনা এত সুন্দর, তাহাকে দেখিতে নিশ্চয় আরও সুন্দর। সুরেশবাবু যখন এই প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, তখন রামলাল পুনরায় তাঁহার প্রদত্ত কাগজ খানি হাতে করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। সুরেশ বাবু কিছু উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন “আবার কি? সব ঠিক হইয়াছে তো?”

রাম। আজ্ঞে না, আর চারি পাঁচ লাইন কম পড়িতেছে।

সুরেশচন্দ্র বড় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, না বাবা পারলেম না, শেষ কালের ফর্ম্মাটা যেন হনুমানের ল্যাজ হইয়াছে। যত ন্যাকড়া জড়াই কিছুতেই আর কুলায় না। তখন

আবার লিখিতে বসিলেন। কিন্তু কি লিখিয়া অবশিষ্ট সাদা কাগজটুকু তিনি পরিপূর্ণ করিবেন, তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিতে পারিতেছেন না। অনেকক্ষণ গভীর চিন্তার পর তিনি এই প্রকার লিখিলেন,—

পুনশ্চ—"এক্ষণে আমরা অতি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে শালিকার বাঁধা ঘাটের নিকট কোন প্রকার ব্যাঘ্র বাহির হয় নাই। মানুষ বা গরু বাছুর কাহারও কিছু অনিষ্ট করে নাই। সাধারণের ভয়ের কোন কারণ নাই। উপরে যাহা লেখা হইয়াছে উহা সর্ব্বৈব মিথ্যা।"

লেখা সমাপ্ত হইলে সুরেশ বাবু উহা রামলালকে পাঠ করিয়া শুনাইয়া বলিলেন 'কেমন লেখা হইয়াছে ?" রামলাল বলিল আজ্ঞে আপনি শুনাইবার পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি উহা চমৎকার হইয়াছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে লেখা কি যে সে লোকের কাজ। তবে আপনার নাকি সাক্ষাৎ গণেশের কলম, তাই লিখিয়া দিলেন। সেই মাস হইতে রামলালের এক টাকা মাহিনা বাড়িয়াছিল।

রামলাল প্রস্থান করিলে সুরেশচন্দ্র যোড়শী বালা লিখিত কবিতাটী বাহির করিয়া আবার পাঠ করিতে লাগিলেন। কবিতাটী এইরূপ লেখা ছিল,—

"তোরা বল গো দূতী কোথা গেলে তারে পাই।
যা'র কথা হ'লে কোথা"
কান পেতে থাকি সেথা,
কোন খানে দেখা হ'লে চুরি করে চাই"

এই কয়েক ছত্র পাঠ করিয়া সুরেশবাবু কাগজখানি

পুনরায় পকেটে রাখিয়া আপন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—এরূপ কবিতা লিখিবার উদ্দেশ্য কি? নিশ্চয় ইহা আমাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছে। কি কারণে যে সুরেশচন্দ্র এরূপ ধারণার বশে আসিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। আপনারা তাহাকে পাগল বলিতে হয় বলুন, কবি বলিতে হয় বলুন, অথবা উপকবি বলিতে হয় বলুন। আমরা তাঁহার বিষয়ে এই টুকু বলিতে পারি যে সুরেশ বাবু এডিটারি লাইনে আসিয়া যে কবি হইয়াছিলেন, এমত নহে। বাল্যকাল হইতে তিনি ঐ প্রকার ভাবের পরিচয় অনেক দিয়া আসিতেছিলেন।





অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর দুইমাস চলিয়া গিয়াছে। ৺পূজার বন্ধে হিমালয়চন্দ্র একমাসের ছুটী লইয়া পশ্চিমে বায়ু সেবনার্থে গমন করিয়াছেন। ফিরিবার সময় ৺গয়াধামে মাতার প্রেতকার্য্য সারিয়া আসিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প মনে আছে। আমরা এতাবৎ হিমালয়চন্দ্রের পুত্র কন্যা সম্বন্ধে কিছুই বলি নাই। তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেশচন্দ্র পিতার আফিসে কর্ম্ম করিতেন এবং ভবিষ্যতে পৈত্রিক সম্পত্তি বড়বাবু গিরিটী পাইবার আশাও, যে গোপনে হৃদয় মধ্যে পোষন না করিতেন, এমত নহে। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র চাকুরিতে বড় নারাজ ছিলেন। তিনি একখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। কার্য্যারম্ভের সময়ে হিমালয় বাবু পুত্রকে ৫০০০৲ টাকা দিয়াছিলেন। নরেশচন্দ্রের অনেকদিন হইল বিবাহ হইয়াছে। সুরেশচন্দ্র এখনও অবিবাহিত আছেন। হিমালয়-গৃহিণী তাঁহার ছোট বধূ-মাতার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিবার জন্য যত্নবতী ছিলেন, কিন্তু সেরূপ সুবিধা মতন একটী কনে পাইতেছিলেন না। কারণ পুত্র মনোভাব জানাইয়াছিলেন

যে বৌ মেমের মত সুন্দরী এবং শিক্ষিতা না হইলে, তিনি বিবাহ করিবেন না। কন্যাটীরও দুই তিন বৎসর হইল বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জামাই বাবাজীও হিমালয়চন্দ্রের নিকট কর্ম্ম করিতেন এবং সেই জন্য তাঁহাকে শ্বশুরালয় থাকিতে হইয়াছিল—তাহাদের বাটী পাবনা জেলায় নাম ফণিভূষণ। রজনী পিতার বড় আদরের কন্যা ছিলেন। রজনীর জন্ম-গ্রহণের পর হইতে হিমালয় বাবুর চাকুরীতে উন্নতি হইয়াছিল, সেই কারণে তিনি কন্যাটীকে বড় ভালবাসিতেন। রজনী কখনও শ্বশুরঘর করিলেন না, পিত্রালয়ে থাকিয়াই আদরে গোবরে মানবী হইতে লাগিলেন। কন্যাটীকে কাছে রাখিয়া তাঁহার মাতাও বেহদ্দ সুখানুভব করিতে লাগিলেন। ইহা ব্যতীত হিমালয় বাবুর শ্বশ্রূঠাকুরাণীও কন্যার কাছে থাকিতেন, তাঁহার আর কেহ ছিল না—আজ প্রায় ১৫ বৎসর হইতে চলিল, হিমালয়ের শ্বশুর-মহাশয় গত হইয়াছেন।

সন্ধ্যার আর অধিক বিলম্ব নাই। দিনমণি ~~দূরে~~ পশ্চিম গগনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার রাঙ্গা মুখখানি এক একবার বাহির করিয়া বলিতেছেন "ডুবি, ডুবি"। দিনমণির আশুবিরহ সম্ভাবনায় কাতর হইয়া পক্ষীকুল বিষম কোলাহল তুলিয়া স্ব স্ব কুলায় ফিরিতেছে। এই সময়ে হিমালয় বাবুর বৃদ্ধা শ্বশ্রূঠাকুরাণী পা ছড়াইয়া বসিয়া ছেলেদের ভূতের গল্প বলিতেছিলেন। রজনী তথায় আসিলে বৃদ্ধা বলিলেন "ওলো আয় তোর খোপা বেঁধে দি।" রজনী সুন্দরী বলিলেন "না আমি খোঁপা বাঁধিব না"। আজ সমস্ত দিন রজনী অভিমানে আছেন পান

খাইয়া ফণিভূষণের গাল পুড়িয়া যাওয়ায় তিনি আজ রজনীকে বলিয়াছিলেন "ছেলের মা হইতে চলিলে, আর পানে চুণ খয়েরটা সমান করিয়া দিতে শিখিলে না? স্ত্রীলোক বাপের বাড়ী অধিক দিন থাকিলেই এইরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে।" বৃদ্ধা খোঁপা বাঁধিবার জন্য জেদ করিতে থাকিলে, রজনী বিরক্তিসহকারে তথা হইতে উঠিয়া গেলেন।

রাত্রে জামাই বাবাজী আহারাদি সমাপন করতঃ আপন কক্ষে শয়ন করিতে যাইয়া দেখিলেন—রজনী মেঘাবৃত, আজ নূতন ব্যবস্থা। রজনী ধরাশয্যায় বসনাঞ্চল বিছাইয়া গড়াগড়ি যাইতেছেন। পার্শ্বে পালঙ্কের দুগ্ধফেননিভ শয্যা শূন্য পড়িয়া কাঁদিতেছে। ফণিভূষণ অভিমানের কারণ বুঝিলেন। তিনি তখন ধীরে ধীরে প্রেয়সীর নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন "রজনী আজ মেঘাবৃত কেন?" কোনও উত্তর নাই দেখিয়া বাবাজী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "রজনী মাটীতে কেন? তোমার এই স্বর্ণকান্তি দেহলতা মাটীতে কি শোভা পায়!"

রজ।—বিরক্ত করিও না বল্‌ছি।

ফণি। বলি আমার কথাটাই শোন না।

রজ। না আমি কিছু শুনিতে চাই না।

ফণি। কিছু না শুনিয়াই দণ্ডবিধান করিতে চাও। তুমি যে দেখ্‌ছি রসিয়ান গভর্ণমেণ্ট। (Russian Government.)

রজ। "কি আমি ইংরাজী কিছু বুঝি না, তুমি আমায় ইংরাজিতে গালি দিতেছ" এই বলিয়া রজনী ফণিভূষণের নিকট হইতে সরিয়া গিয়া কাঁদিতে বসিলেন। বাবাজী সসব্যস্তে প্রেয়সীকে নানা বাক্যে সান্ত্বনা করিতে বসিলেন। এইবার

প্রেয়সী ক্রোধে চীৎকার করিয়া উঠিলেন "বাবা গো মেরে ফেল্লে গো একটু ঘুমুতে দেয় না গো।" ফণি প্রেয়সীর মান ভাঙ্গিতে অপারক হইয়া হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িলেন "হায়, হায়! মা আমার বড়লোকের কন্যা দেখে বড় সাধ করে বিয়ে দিয়েছিলেন। এখন যে মান ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'ল। এর চেয়ে যে ধান ভেঙ্গে খাওয়া ভাল ছিল।"

রজনীর পার্শ্বের ঘরে বৃদ্ধা শয়ন করিয়াছিলেন। এত রাত্রে রজনীকে চীৎকার করিতে শুনিয়া আলোক হস্তে তিনি আপন কক্ষ হইতে নির্গত হইলেন এবং তাঁহার কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন "ওলো যাদুমণি! শীঘ্র ওঠ নাতজামাই মেয়েটাকে মেরে খুন করে ফেল্লে।" রজনীর মাতা তৎক্ষণাৎ শয্যা ত্যাগ করিয়া রজনীর কক্ষদ্বারে উপনীত হইলেন এবং কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন "কি হইয়াছে মা?" রজনী কিছু অপ্রতিভ হইলেন। ফণিভূষণ দ্বার উন্মোচন করিয়া বলিলেন "কিছু হয় নাই, স্বপ্নে ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল।" "তাই রক্ষে" এই বলিয়া রজনীর মাতা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। জামাইবাবাজীও পুনরায় কপাট বন্ধ করিলেন। বৃদ্ধা তাঁহার কন্যাকে বলিলেন "দেখ তা নয়, উহাদের দুইজনে ঝগড়া হইয়াছে—কি জানি বাপু নাতজামাইটা যে গোঁয়ার। আমি হরিদাসীকে ডাকি সে আসিয়া দরজাটার কাছে শুইয়া থাকুক। রজনীর মাতা "তাই ভাল" বলিয়া শয়ন করিতে গেলেন। বৃদ্ধা ডাকিলেন "হরিদাসী একবার উপরে আয়তো।" হরিদাসী উহাদের পরিচারিকা। সর্ব্বনাশ! হরিদাসী তখন উপরে আসে কি করিয়া। সে

তখন নাগর লইয়া আপন কক্ষে নৃত্য করিতেছিল। কিন্তু মনিব ডাকিতেছে, না আসিলেও নয়। কাজে কাজেই আলু থালু বেশ শিথিল করবী হরিদাসী আসিল। বৃদ্ধা বলিলেন "হরিদাসি তুই এই দরজাটার কাছে একটু শুয়ে থাক। রজনী ভয় পেয়েছে কি জানি কি হয়। হরিদাসী মনে মনে বুড়িকে যমালয়ে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। নাগরের সোহাগ ফেলিয়া তাহার কি এখন লোকের দরজায় পড়িয়া থাকিবার সময়। হরিদাসী মনে মনে ঠিক করিয়া লইল। বৃদ্ধা চলিয়া যাইলেই সেও পুনরায় নাগরের বাহুপাশে গিয়া বদ্ধ হইবে।

এদিকে হরিদাসীর ফিরিতে বিলম্ব হওয়ায় তাহার নাগরমহাশয় অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছিল। একটা চীৎকার ধ্বনি সেও শুনিতে পাইয়াছিল। এক্ষণে ব্যাপার কি জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া ধীরে ধীরে সিড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছিল। কিন্তু বৃদ্ধাকে আলোক হস্তে সেইদিকে আসিতে দেখিয়া দ্রুতপদে নামিয়া গেল। আলোক ছায়ায় বৃদ্ধা দেখিলেন যেন একটা বিকট মূর্ত্তি তাঁহার ঘর হইতে নির্গত হইয়া গেল। বৃদ্ধা মনে মনে রাম নাম জপিতে লাগিলেন। তাঁহার বড় ভূতের ভয়—কিন্তু সে কথা লোকের নিকট প্রকাশ করিতেও পারেন না। কারণ তিনি প্রত্যহ ভূতের গল্প করিতে বসিয়া বলেন "যে তিনি ছেলে বেলায় শ্বশুরবাড়ীতে ভূতের সঙ্গে ঘর করেছেন, ভূতের হাত হইতে জিনিষ লইয়াছেন। এক্ষণে যদি প্রকাশ পায় যে ভূতের ভয়ে, তিনি ঘরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, তাহা হইলে তাঁহার গল্পের পশার নষ্ট হইয়া

যাইবে। বৃদ্ধা বড় বিপদে পড়িলেন—ভূতের ভয়ে আপন কক্ষে প্রবেশও করিতে পারিতেছেন না, কাহার নিকট প্রকাশও করিতে পারিতেছেন না। কিয়ৎকাল ভাবিয়া চিন্তিয়া বৃদ্ধা কর্ত্তব্য স্থির করিলেন, যে প্রভাত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। এই টুকু সময় তিনি হরিদাসীর ঘরে একটু গড়াইয়া লইবেন। এইরূপ স্থির করিয়া বৃদ্ধা নীচে নামিলেন। এদিকে হরিদাসীর নাগর হরিদাসীর বিলম্বে অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছিল। এক্ষণে বৃদ্ধা সেই কক্ষে প্রবেশ করিবা মাত্র রসের সাগর নাগররাজ বৃদ্ধাকে বাহুপার্শ্বে বদ্ধ করিল এবং দুই একটী চুম্বন করিয়া বলিল "প্রাণেশ্বরী! এত বিলম্ব কেন?" বৃদ্ধা অবাক ও হতজ্ঞান। প্রেয়সীকে নিরুত্তর দেখিয়া নাগর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "কথা কহিতেছ না যে?" তাহার পর আবার চুম্বন, চুম্বনের উপর ঘন ঘন চুম্বন। নাকে মুখে চোখে যেখানে সেখানে চুম্বন করিতে থাকিল। এইবার বৃদ্ধা চুম্বন জ্বালায় অস্থির হইয়া ডাক ছাড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। নাগররাজ তখন আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া দ্রুতগতি চম্পট দিলেন। বৃদ্ধার চীৎকারে বাটীস্থ সকলেই সেই খানে উপস্থিত হইলেন এবং সমুদয় ব্যাপার অবগত হইয়া পরদিন হরিদাসীকে নষ্ট-চরিত্রা জানিয়া কার্য্যে জবাব দিলেন। এই নাগরটী আমাদের ঠাকুরদার পৈত্রিক সম্পত্তি কেশবচন্দ্র ব্যতীত আর কেহ নয়।



নবম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুরদাদা আহারে বসিয়াছেন। দুই পার্শ্বে দুই রাণী বিরাজিতা। আজ ঠাকুরদার জন্মতিথি পূজা উপলক্ষে ভোজনায়োজন কিছু অসাধারণ রকমের হইয়াছিল। উভয় রাণী মিলিয়া রন্ধন করিয়াছেন। বড়রাণী অম্বল ও পায়েস রাঁধিয়াছেন। ছোটরাণী সুক্তনি, ঝোল প্রভৃতি ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছেন। ঠাকুরদা গণ্ডুস করিবা মাত্র বড়রাণী স্বীয় অঙ্গুলী নির্দ্দেশে অম্বলের বাটীটা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন "এইটা আগে খাও আমি রাঁধিয়াছি।" ছোটরাণী বলিলেন "সুক্তনি দিয়া প্রথমে খাও, তারপর ঝোল, অম্বল প্রভৃতি খাইও।" দুইরাণী দুইপ্রকার আদেশ করিলেন—এদিকে রাজা বেচারির আহার সঙ্কট উপস্থিত হইল। হিসাবমতন অগ্রে সুক্তনি দিয়া আহার করাই উচিত, কিন্তু তাহা হইলে বড়রাণী রক্ষা রাখিবেন না। জন্মতিথির দিন পরিপাটী ভোজন সামগ্রী সম্মুখে পাইয়াও অনাহারে দিন যাইবে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে ঠাকুরদা মহাশয় অনামিকা সাহায্যে পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ অম্বল গ্রহণ করতঃ আপনার কপালে

একটী দীর্ঘ ফোটা কাটিয়া স্তুকনি সাহায্যে ভোজনারম্ভ করিলেন। বড়রাণী অমনি ফোঁস করিয়া উঠিলেন "ও কি রকম হইল।" ঠাকুরদা বলিলেন "তোমার মান রাখা হইল। কিন্তু তোমার বায়না যে রকম তাহাতে বারমাস তোমার মান মর্য্যাদা রাখিতে পারি কি না সন্দেহ।" বড়রাণী একটা কলহের সূত্রপাত করিতেছিলেন, কিন্তু এই সময়ে হিমালয়চন্দ্রের বৃদ্ধা শ্বশ্রূঠাকুরাণী তাঁহাদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বড়রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন কিগো বড় অসময়ে যে?

বৃ। একটু কাজে আসিয়াছি মা।

ঠা। আমাকে দরকার?

বৃ। একটা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, কত খরচ পড়িবে তাই জানিতে আসিয়াছিলাম।

ঠা। কি রকমের প্রায়শ্চিত্ত না শুনিলে কিরূপে বলিব।

"গ্রহের কথা আর কি বলিব" এই বলিয়া বৃদ্ধা তখন অতি নিম্নস্বরে ঠাকুরদাকে সমুদয় ঘটনা বলিতে লাগিলেন। ঠাকুরদা শ্রবণকালে মধ্যে মধ্যে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন "তাইত কি সর্ব্বনাশ, অনেক টাকা লাগবে যে দেখচি, কি ভয়ানক এরূপ তো শুনি নাই কখন ইত্যাদি।" বৃদ্ধা বলিলেন "যাহাতে কমে হয় এইটুকু আপনাকে করে দিতে হবে, নতুবা আমি টাকা কোথায় পাইব।" ঠাকুরদা বলিলেন "আচ্ছা সে জন্য চিন্তা নাই যত কমে হয় এবং যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাই করিয়া দিব। তবে ব্যাপারটা কিছু গোলমেলে রকমের দেখ্‌চি।" আচ্ছা লোকটা কি জাতি বলিতে পারেন?

বৃ। না বাবা সে সকল কিছুই বলিতে পারি না।

ঠা। আমি পাঁজি পুথি দেখ্‌ছি, যদি ব্রাহ্মণ হয় তবে কিছু কমে হইতে পারিবে।

"বোধ হয় ব্রাহ্মণই হইবে। যাহা হউক আপনি একটা ফর্দ্দ ধরিয়া আমার জামাইকে দিবেন।" এই বলিয়া বৃদ্ধা তথা হইতে আপন বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

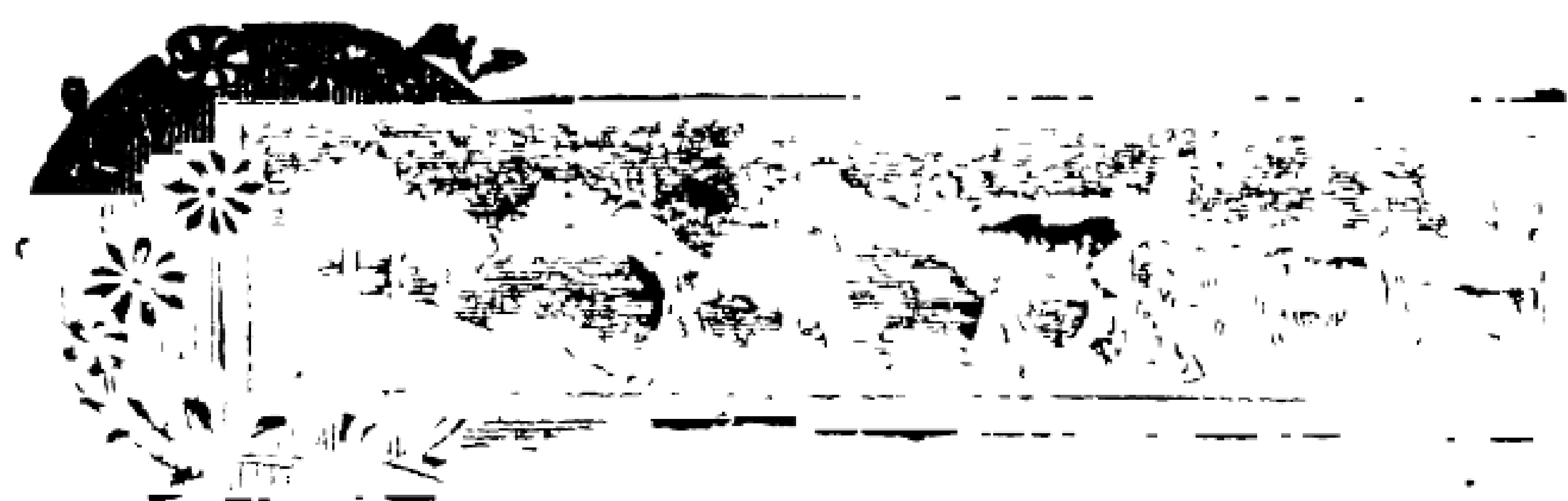
ঠাকুরদা ইত্যবসরে ব্যঞ্জনাদি সমাপ্ত করিয়া পায়েসের বাটী ধরিয়াছিলেন। এক্ষণে পায়েস একটু মুখে দিয়াই অনন্য মনে বলিয়া ফেলিলেন "পায়সটায় যে ধরা গন্ধ হইয়াছে।" বড়রাণী আর কোথায় আছেন, রণচণ্ডী মূর্ত্তি ধরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। বলিলেন "বুড়া বয়সে একেবারে গেল্লায় গিয়েছ, তার আর কি হবে। পায়সটা আমি রাঁধিয়াছি কি না তাই পোড়ার মুখে—"

ঠা। আমি কি মিথ্যা বলিতেছি, না তোমার সহিত রহস্য করিতেছি। তুমি তো খাইয়া দেখিবে।

বড়রাণী তখন ক্রোধে জ্ঞানশূন্যা হইয়াছিলেন বলিলেন— "আমি খাইয়া দেখিয়াছি, না খাইয়া কি তোমায় দিয়াছি।" বড়-রাণীর কথা শুনিয়া ছোট হাসিলেন। ঠাকুরদাও হাসিয়া বলিলেন "তাই বল এ নারায়ণের প্রসাদ"। মানুষ রাগিলে ঐ প্রকার নির্ব্বোধের ন্যায় কথা বলিয়া থাকে। নতুবা বড়রাণী যে সত্য সত্য ঠাকুরদার ভোজনের আগে পায়েস ভোজন করিয়াছিলেন, এমত নহে। বড়রাণী ক্রোধে জ্ঞান শূন্যা হইয়া রোগীর মুখে রোগ ব্যাক্তর ন্যায় বলিয়া ফেলিলেন "যত খারাপ হইল পায়স। ডালে ঝোলে কিছু হইল না। আমি

যে স্বহস্তে একমুঠা নুণ ডালের কড়ায় ফেলিয়া দিয়াছিলাম। কই একবার তো বলিলে না যে ডালটা নুণে পুড়িয়া গিয়াছে। পদার্থ কি কিছু রাখিয়াছে, যে উহার উপর এক কথা বলিবে?" ছোটরাণী বলিলেন "দিদি বড় উপকার করিয়াছ, আমি আজ ডালে নুণ দিতে ভুলিয়া ছিলাম"। ঠাকুরদা বড়রাণীর গল্প শুনিয়া একেবারে অসাড় মারিয়া গিয়াছিলেন এক্ষণে গাত্রোত্থান করতঃ বলিলেন "বড়রাণী এত গুণ তোমার।"





দশম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

হিমালয়বাবু পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখনও দুই তিন দিবস তাঁহার ছুটি আছে। অপরাহ্নে বৈঠকখানায় বসিয়া বাবু আলবোলায় ধূম পান করিতেছিলেন। সাহারাম, গয়ারাম, পশুপতি প্রভৃতি কতকগুলি বঙ্গমাতার গর্ভলাব তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। নানা বিষয়ে তাঁহাদের আলোচনা হইতেছিল। কেহ বলিতেছেন বাবু একটা বাগান কিনুন, কেহ বলিতেছেন একটা জুড়ি ক্রয় করুন। অন্যে বলিতেছেন বাবু আমাদের দেশের দিকে খানিকটা জমি লইয়া প্রজা বসাইয়া চাসবাসের একটা ব্যবস্থা করুন। হিমালয় বাবু বলিলেন "দেশের বাগান থেকে মাঝে মাঝে কিছু কিছু তরিতরকারী আসে। এবারে যেউ চ্ছা এসেছিল—আহা উচ্ছাগুলা কি মিষ্ট। বাবু উচ্ছাতে মিষ্টরস পাইয়াছেন শুনিয়া, সাহারাম বলিলেন "আজ্ঞে তাহা হইবে না কেন? স্থান বিশেষে উচ্ছে মিষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা উচ্ছের চাস করিয়া উহার রসে গুড় তৈয়ারী করে। আমার এক বন্ধু সেই গুড় এক কলসী

পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, খাইয়া দেখিলাম আসল গুড় কোথায় লাগে! ইনি তাঁহার সম্বন্ধীর একটী চাকুরীর উমেদার ছিলেন। সুতরাং বাবুকে উচ্ছে রসের গুড় খাওয়াইতেছিলেন। এই সময়ে বেহারা তামাকুর কলিকা পাল্টাইয়া দিতে আসিল। হিমালয়বাবু বলিলেন "ওরে ভজা! পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যিকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করিতে বলিস্ তো।" "যে আজ্ঞে" বলিয়া ভজা আপন কার্য্যে চলিয়া গেল। সাহারাম বলিলেন "ঠাকুরদার কথা বলিতেছেন—তিনি কি ছোট-ঠানদিদিকে একলা ফেলে আস্‌তে পারিবেন?"

পঞ্চ। বাবা সে যা স্ত্রীলোক, আমার বোধ হয়, এককড়া কড়ি পেলে বনের মাঝে নগর বসাতে পারে।

হি। কেন হে তুমি কি এমন দেখেচ?

পঞ্চ। আজ্ঞে সেদিন আমি আপনার এখান থেকে বেরিয়ে ঐ দিক দিয়ে বাড়ী যাইতেছিলাম—

গয়া। ঐদিক দিয়া তোমার বাড়ী যাইবার কি সোজা রাস্তা নাকি? দেখছেন মশাই।

হি। আহা চুপ কর না, তারপর কি হোলো হে।

পঞ্চ। আজ্ঞে দরজায় দাঁড়িয়েছিল, তা আমায় দেখে একটু সরেও গেল না মশাই, মাথার কাপড়টা তাও একটু টেনে দিলে না, কিছুমাত্র লজ্জা সরম নাই।

গয়া। তোমাকে বোধ হয় একটা পাল্কীর বেহারা কিম্বা বাবুদের বাগানের মালী মনে করেছিল, সেই জন্য লজ্জা করেনি। তা আমাদের দেশের প্রথাই ঐরকম। এদেশে স্ত্রীলোকেরা বেহারা, মালী, তেলওয়ালা, কি গোয়ালা দেখিয়া

লজ্জা করে না। ইহাদের সম্মুখে বাহির হয়, কথাও কহে এবং জিনিষের দরদস্তরও করে।

পশু। তুমি যে বড় লম্বা লম্বা কথা বল্‌চো হে।

গয়া। ছি পশু! তুমি রাগ ক'ল্লে।

পশু। খবরদার মুখে লাগাম দিয়া কথা কও বল্‌চি।

হি। তাইত হে পশু! তোমার আজ কি হয়েছে, যে একটুতেই যে রেগে উঠ্‌ছ?

পশু। আজ্ঞে আপনি বলুন না কেন, তা বলিয়া উহারা বলিবে।

হি। কি বলিলাম হে?

পশু। আপনারা সকলেই আমাকে পশু প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা বলিয়া গালি দিতেছেন।

এতক্ষণে সকলে পশুপতিবাবুর রাগের কারণ বুঝিতে পারিলেন। গয়ারাম বলিলেন "দেখ ভাই আদর করিয়া পশু বলিয়াছিলাম, গালি দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না। এখন দেখিতেছি তোমার পিতা মাতাই, ইহার জন্য অধিক অপরাধী। ছেলের এমন নামকরণ করিয়াছিলেন যে বন্ধুবান্ধবে একটু আদর অভ্যর্থনা করিলেই, একেবারে গালাগাল।"

এই সময়ে সহসা তথায় ঠাকুরদার আগমনে, তাঁহাদের বিবাদ মিটিল। তখন হিমালয়ের পারিষদবর্গ ঠাকুরদাকে লইয়া পড়িলেন। গয়ারাম বলিলেন "ঠাকুরদা যে আজ অসম্‌-সাহসের কাজ করিয়াছেন দেখিতেছি। ছোটঠান্‌দিদিকে একলা ফেলে এতদুর চলে এসেছেন?" গয়ারামের কথা শেষ না হইতেই "মেরে ফেল্লে, মেরে ফেল্লেরে, গুয়োবেটারা

ওখানে হাত কেন" ? এই বলিয়া ঠাকুরদা সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। সকলেই সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইল ঠাকুরদা কোথায় লাগিল।"

সাহা। তুমি যে একেবারে ঠাকুরদার বিষফোড়ায় হাত দিয়াছ—লাগিবে বৈকি।

পশু। স্বধু বিষফোড়া, গোদের উপর বিষফোড়া বল।

হিমালয়বাবু বলিলেন "তাইতো হে তোমাদের কথা-বার্ত্তার যে কিছু আন্দাজ পাওয়া যায় না। বিষফোড়াই বা কোথায়, আর তাহাতে হাতই বা দিল কে ?"

পশু। আজ্ঞে এটা আর বুঝিতে পারিলেন না—বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা হইল—ঠাকুদার গোদস্বরূপ। তাহার উপর আবার সুন্দরী যোগ হওয়ায় গোদের উপর বিষফোড়া হইয়াছে। সুতরাং সেখানে বড় ব্যথা, ঠাকুরদাকে সর্ব্বদাই সাবধানে থাকিতে হয়।

ঠাকু। ব্যাখ্যা মন্দ কর নাই হে পশু! তবে কিঞ্চিৎ ব্যাকারণ অশুদ্ধ হইতেছে বল "গোদস্যপরি-বিষস্ফোটক"।

পশু। হাঁ ঠাকুরদা ছোটঠান্‌দি কি আপনাকে ঠাকুরদা ব'লে ডাকেন।

ঠাকু। বেশ করে ঠাকুরদা বলে, তোমার তাতে কি হে বাপু, সে যদি আমায় বাবা বলে, তাতে তোমার কি হে।

হি। বাজে কথায় কাজ নাই। এখন একটা ফর্দ্দ ধরুন দেখি, একটা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

"ফর্দ্দ আমি করিয়া আনিয়াছি" এই বলিয়া ঠাকুরদা হিমালয়বাবুর হাতে একখানি লম্বা চওড়া কাগজ প্রদান

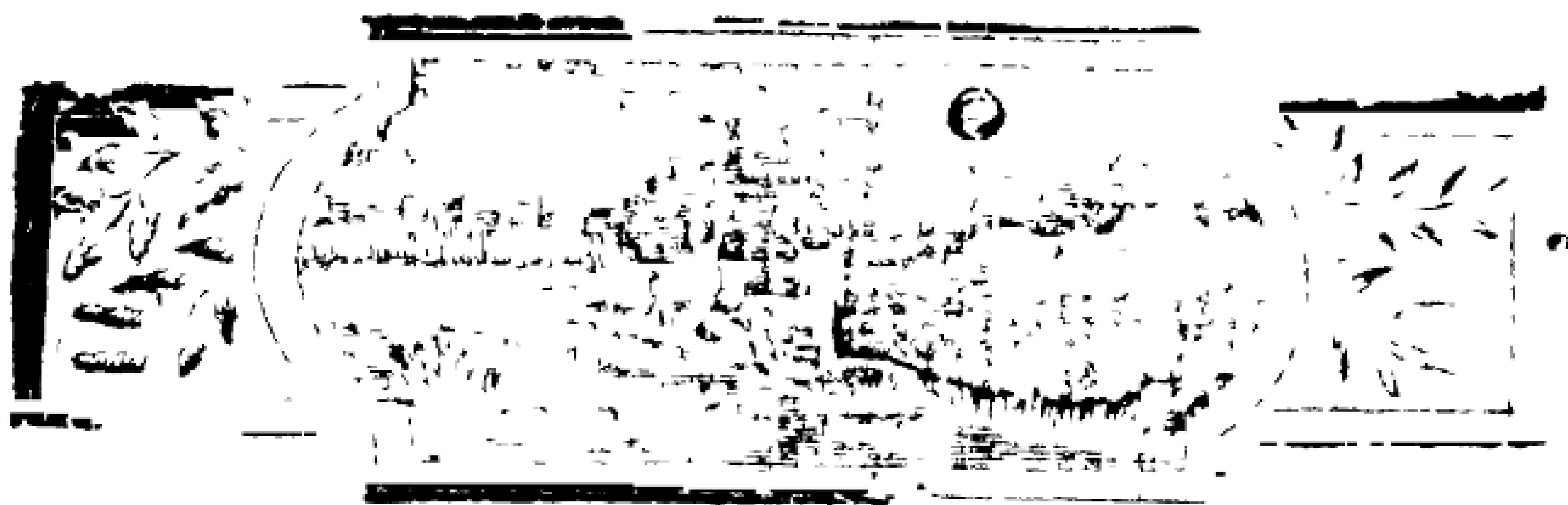
করিলেন। ফর্দ্দখানি আদ্যপান্ত পাঠ করতঃ হিমালয়বাবু শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন "কি সর্ব্বনাশ একশত টাকা ধরিয়াছেন। এ আপনি কি ফর্দ্দ ধরিলেন।"

"উহার কমে হইবার উপায় নাই। ঘটনাটা যে সৃষ্টিছাড়া, ও পাপের প্রায়শ্চিত্তই নাই। তবে আমি হ'লেম সেকালের পণ্ডিত অনেক শাস্ত্র জানা আছে, তাই একরকম ক'রে একটা খাড়া ক'রে তুলেছি। আমি তবে এখন আসি তোমরা উদ্যোগ আয়োজন করিয়া রাখিও"। এই বলিয়া ঠাকুরদা তথা হইতে ত্বরায় প্রস্থান করিলেন। ঠাকুরদার প্রস্থানের কিয়ৎকাল পরে হিমালয়বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুরেশচন্দ্র তথায় আসিলেন। হিমালয়বাবু তাঁহাকে ফর্দ্দখানি দেখাইয়া বলিলেন "ওহে, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য একশত টাকার ফর্দ্দ দিয়া গিয়াছে।"

সুরে। উনি একশত টাকার ফর্দ্দ দিয়াছেন বলিয়া কি একশত টাকাই ব্যয় করিতে হইবে। আপনি বাজার জাচাই করিয়া দেখুন। আজকাল সকল কাজ কর্ম্ম তো দরদস্তুর করিয়া হইতেছে।

হি। আচ্ছা একবার কাল্তুতর্কালঙ্কারকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাউক।

সুরে। ওরূপভাবে কার্য্য হইবে না। আপনি আমার মাসিক পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন দিন। তাহাতে এইরূপ লিখিয়া দিন—"একটা প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। পুরোহিত মণ্ডলি দর পাঠান। আপনি দেখিবেন পাঁচ টাকার মধ্যেই আপনার কার্য্য হইয়া যাইবে।"



একাদশ পরিচ্ছেদ।

—•⁘✻⁘•—

আজ বড় দুর্দ্দিন। একে পৌষমাসের শীতে হাত পা বাহির করা যাইতেছে না, তাহার উপর সমস্তদিন ঝড় ও বৃষ্টি হইতেছে। বৃক্ষোপরি কাক, চীল প্রভৃতি পক্ষীগণ ভিজিয়া খুন হইতেছে। ছাতুবাবুদের গরুগুলা রাস্তায় দাঁড়াইয়া তাহা ভিজিতেছে। উহার মধ্যে যে গুলা বুদ্ধিমান তাহারা গাড়িবারাণ্ডাওলা বাটীর নিম্নে আশ্রয় লইয়াছে। গরিব-লোকদিগের আজ বড়ই কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। একটু এমন বস্ত্র নাই, যে এই শীতে মুড়ি দিয়া শীতের জ্বালা নিবারণ করে। তাহার উপর আবার চাল চুয়াইয়া উপর হইতে টপ টপ করিয়া জল পড়িতেছে। কিন্তু লক্ষ্মীর বরপুত্র-দিগের আজ মাহেন্দ্রযোগ উপস্থিত। তাঁহারা এই ঠাণ্ডার দিনে কেবল গরমাগরমের ব্যবস্থা করিতেছেন। কেহ খান-সামাকে গরম কুঁকড়ার ঝোল বানাইতে হুকুম করিয়া তাকিয়া হেলান দিয়া সট্‌কার সহিত আলাপ করিতেছেন। কেহ বা লাল পাণি খাইয়া কল্পনা সাহায্যে এ বাদলা বৃষ্টিময় সহর ত্যাগ করতঃ মলয় পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া

রমণীসঙ্গ উপভোগ করিতেছিলেন। আমাদের নগেন্দ্র এই সময়ে একখানি মোটা চাদরে আপাদ মস্তক মুড়ি দিয়া, আপন কক্ষে বসিয়াছিলেন। আজিকার ঠাণ্ডা নগেন্দ্রকেও লাগিয়াছিল। কারণ তিনি কাণ খাড়া করিয়া বসিয়াছিলেন, কতক্ষণে ফেরিওয়ালা হাঁকিবে "গরমাগরম অবাক জলপান"। এই সময়ে প্রভাবতী একখানি পাত্রে করিয়া আগতৈলাসিক্ত কিছু গরম মুড়ি ও কলাইশুঁটি সিদ্ধ ও দুইটী মনোহর লঙ্কা লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রভাবতীকে দেখিয়া নগেন্দ্র বলিলেন "প্রভা! তুমি কি আমার মনের কথা জানিতে পার? এই বাদলায় গরম মুড়ি খাইবার স্পৃহা হইতেছিল, কিন্তু আমি তোমায় সে কথা কিছু বলি নাই তো।" প্রভাবতী মৃদু হাসিয়া বলিলেন "আমি হইলাম জ্যোতিষার্ণব কাশীচন্দ্রের কন্যা, হাতে গুণিয়া সকল জানিতে পারি।"

নগে। বটে! তবে আমার হাতটা একবার গণিয়া দেখনা।

নগেন্দ্র মুড়ি ভক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন। প্রভাবতী নগেন্দ্রের হাত গণিতে বসিলেন। কিয়ৎকাল পরীক্ষার পর প্রভাবতী বলিলেন "তাইতো তোমার যে দুইটা বিয়ে দেখছি! ইহাতে নগেন্দ্র ভারি রাগ করিয়া হাত সরাইয়া লইয়া বলিলেন "আর গণিতে হইবে না তোমার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়াছি।"

প্রভা। ভারি যে রাগ দেখিতে পাই, আমি মর্‌লে যেন উনি আর বিয়ে কর্‌বেন না।

নগে। কেন বিবাহ করিব না, দশটা বিবাহ করিব। আমি কি সে জন্য হাত সরাইয়া লইলাম। আমি বুঝিলাম

তুমি হাত দেখিতে জান না। কারণ আমার দুইটা বিয়ে সত্য জানিলে, তুমি এতক্ষণ মুর্চ্ছা যাইতে। যাক্, আমি তোমায় আমার কয়টা বিয়ে তাহা গণিয়া দেখিতে বলি নাই। আমার যে চাকুরি গেল, এক্ষণে আমাদের কি উপায়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। অনাহারে সপরিবারে মরিতে হইবে, কিম্বা দ্বারে দ্বারে পেটের জ্বালায় ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইবে। এই সকল গণিয়া বলিতে পার কি?

প্রভা। কেন পারিব না, খুব পারি।

নগে। তবে বল দেখি কিরূপে আমাদের সংসার চলিবে?

প্রভা। প্রথমে আমার গহনাগুলি বাঁধা দিয়া সংসার চলিবে।

নগে। তোমার গণনার ছিরিছাঁদ কিছুই নাই—কথাটাও কিন্তু একেবারে মিথ্যা নয়। আচ্ছা গহনাগুলি ফুরাইলে কি হইবে?

প্রভা। গহনাগুলি সুদে আসলে মহাজনের পাওনায় বিক্রয় হইয়া যাইবে। তারপর তুমি চাকুরি করিবে। সংসার চলিতে থাকিবে। সূর্য্যদেব পূর্ব্বগগনে উদয় হইলেই পশ্চিম গগনে অস্ত যাইতে বাধ্য আছেন। সুতরাং আমাদেরও দিন সেই সঙ্গে যাইবে।

নগে। এইবার তোমার গণনা ভুল হইয়াছে। আমি চাকুরী আর করিব না। পঁচিশ, ত্রিশ বেতনের চাকুরী আমি পাইতেছি, কিন্তু চাকুরিতে আমার আর প্রবৃত্তি নাই। একটা ব্যবসা করিবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু তাহাতে অনেক গুলি টাকার প্রয়োজন—কি হইবে জানি না!

প্র। মা জগদম্বার মনে যা আছে তাই হবে—তুমি অত ভেবো না।

এই সময়ে বাহির হইতে কড়াধ্বনি করতঃ কে ডাকিল "নগেন্দ্র বাড়ী আছ হে।"

নগেন্দ্র উত্তর দিলেন "কে ডাকে, যাইতেছি।" নগেন্দ্র যত বলিতেছেন, আছি, যাইতেছি, বাহিরে ততই কড়ানাড়ার শব্দ ও ডাকের উপর ডাক। নগেন্দ্র বলিতেছেন "যাইতেছি।" বাহির হইতে প্রশ্ন হইতেছে, "নগেন্দ্র কোথায় গিয়াছে, কখন আসিবে?" প্রভাবতী নগেন্দ্রকে বলিলেন "শীঘ্র উঠিয়া দেখ কে মিন্সেটা, দরজা বুঝি ভেঙ্গে ফেলে।"

নগে। এত উৎপাত আর কার বুঝ্‌তে পার্চ্ছ না?

প্র। তোমার প্রাণের হরেন বুঝি?

আবার বাহির হইতে শব্দ হইল—"তাহা হইলে আজ আর দেখা হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই?"

"তোমার মুণ্ডপাত" বলিয়া নগেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিলেন। নগেনের পুত্র ফণি ইতি মধ্যে দরজা খুলিয়া "কাকা" বলিয়া আগন্তুকের ক্রোড়ে এক লাফে উঠিল। আগন্তুকও "পাজি-বেটা" বলিয়া ফণির মুখ-চুম্বন করতঃ আপন অঙ্গরাখার পকেট হইতে বিস্কুট ও লজেঞ্জেস্, বাহির করিয়া ফণির হাতে, মুখে ও জামার পকেটে যেখানে স্থান পাইলেন ভরিয়া দিলেন।

আশাতীত দ্রব্যাদি পাইয়া ফণি তিন লম্ফে পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—"বাবা! কাকা আসিয়াছে—তারপর তাহার ছোট ভগ্নীটিকে ডাকিয়া তাহাকেও কিছু লজেঞ্জেস ভাগ দিল। প্রভাবতী সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে না হইতে

হরেন্দ্র আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রভাবতী ধীরে ধীরে অপর কক্ষে গমন করিলেন।

নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হে হরেন? অনেক দিনের পরে যে—কেমন আছ?"

হরে। কপোত কপোতি যথা বটবৃক্ষোপরি—কিবা ঝড় কিবা জল।

নগে। না হে না, তোমার যেমন কোন ভাবনাই নাই। যে বিপদে পড়িয়াছি।

হরে। হাঁ সত্য বটে, আমি আসায় কিছু বিপদ ঘটিল বটে, কিন্তু ক্ষণিক সে বিচ্ছেদ জ্বালা—আমি এখনি যাইব।

নগে। যাবে কেন, তোমার সঙ্গে কথা আছে, কিছু টাকা ধার দিতে পার?

হরে। না তা'হলে নিতান্তই ব'সতে দিলে না। একবারে টিকিধরে কথা পেড়েছ। আমি তাহ'লে এখন আসি ভাই, একটু বিশেষ দরকার আছে!

নগে। ওহে স্তধু হাতে দিতে ব'লচি না, ছয় সাতশত টাকার মতন গহনা বন্ধক রাখব, কিন্তু আমার হাজার টাকার প্রয়োজন।

হরেন্দ্র, নগেনের বাল্যবন্ধু। হরেনের অবস্থা ভাল। তাঁহার পিতা যে ধনসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে হরেন্দ্রর কখনও খাওয়া পরার কষ্ট পাইতে হইবে না। তথাপি হরেন অন্যান্য কার্য্য করিয়া বেশ দুই পয়সা রোজকার করিতেন। হরেন্দ্র বংশের বাতি। তাঁহার অন্য কোনও সহোদর ছিল না। পুত্রের বিবাহ দিবেন বলিয়া হরেনের

মাতা বধুর জন্ম গহনা পর্য্যন্ত প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মনের বাসনা মনেই স্থগিত রাখিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। হরেন্দ্র, কি কারণে বুঝা যায় না, অদ্যাপি বিবাহ করেন নাই। হরেন্দ্র অতিশয় দয়ালু চিত্ত ছিলেন! পাড়া প্রতিবাসী সকলেই তাঁহার দ্বারা দায় অদায়ে উপকৃত হইতেন। বন্ধুবান্ধব কেহ পুত্র কন্যা লইয়া তাঁহাদের বাটিতে বেড়াইতে আসিলে হরেন তাহাদিগকে অত্যন্ত আদর করিতেন এবং নানাবিধ খেলনা ও খাদ্য সামগ্রী সকল দিতেন। এই ব্যাপারে তাঁহার প্রত্যহ দুইটাকা এক টাকা ব্যয় হইত। কাণা, খোড়া, গরীব, দুঃখীকেই কিছু চাহিলেই দুই চারি আনা পয়সা পাইত। হরেন্দ্র বড় স্পষ্ট বক্তা ছিলেন। সে কারণে সময়ে সময়ে তাঁহার কথাগুলা কাহারও কাহারও পক্ষে বড় কঠিন হইয়া পড়িত। কিন্তু অন্তরে তাঁহার কোনও গোল ছিল না! হরেন্দ্র আপনি আপনার কর্ত্তা ছিল। কাহারও পরামর্শ লইয়া বড় একটা কোন কার্য্য করিত না, আপনি যাহা ভাল বুঝিত তাহাই করিত! কেবল আমাদের নগেন্দ্রের কথার অত্যন্ত বাধ্য ছিল।

দুর্ব্বলের প্রতি বলবানের অন্যায় আবদার হরেন্দ্র একটুও সহ্য করিতে পারিত না—এবং এই ক্ষেত্রে তিনি কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না—মহাবলবান ও ধনবান অসৎ ব্যক্তি হরেন্দ্রকে ভয় করিতেন।

নগেন্দ্র বন্ধুকে তাঁহার চাকুরী যাওয়ার ঘটনা সমস্ত শুনাইলেন! হরেন্দ্র হিমালয়ের আচরণ শুনিয়া অবাক হইয়া

গেলেন। হিমালয়ের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হইতে লাগিল। তিনি সে বিষয়ে অধিক আর আলোচনা না করিয়া নগেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাকা লইয়া তুমি কি করিতে মনস্থ করিয়াছ।"

নগে। তাহা হইলে আমি সেই টাকায় একটা ব্যবসা করি। অবশ্য তোমায় সুধুহাতে দিতে বলিতেছি না। সাত আট শত টাকার গহনা তোমার নিকট বন্ধক রাখিব।

হরে। বটে, কৈ গহনার বাক্স লইয়া আইস, দেখি কি রকম গহনা।

নগে। বাক্সে আর কোথায় গহনা। ঐ প্রভাবতীর গায় আছে, আমি খুলিয়া লইয়া আসিতেছি তুমি একটু অপেক্ষা কর।

নগেন্দ্র উঠিয়া যাইতেছিলেন। হরেন তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া বসাইয়া বলিলেন "নগেন তুমি কি পাষণ্ড। আমি তোমায় ভাল লোক বলিয়া জানিতাম। আমি তোমার মতন বদ-লোককে টাকা ধার দিতে প্রস্তুত নহি।"

নগে। আমি ব্যবসা করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য লইতেছি, নষ্ট করিবার জন্য নয়।

হরে। ব্যবসা করিবার জন্য লও আর স্বর্গে যাই-বার সিঁড়ী প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্যেই লও, যে ব্যক্তি প্রভাবতীর অঙ্গ হইতে গহনা খুলিয়া লইতে পারে, সে চুরি ডাকাতি ভ্রূণহত্যা ব্রহ্মহত্যা সকল কার্য্যই করিতে পারে। এরূপ লোককে কোন্ সাহসে টাকা ধার দিতে পারি!

নগে। ভাই. নিতান্ত দায়ে পড়িয়া এই কার্য্য করিতে

প্রস্তুত হইয়াছি। নতুবা তুমি কি জাননা আমি প্রভাবতীকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি।

নগেনের এই ভালবাসার কথা শুনিয়া হরেন্দ্র এরূপ বিকট হাস্য করিয়া উঠিলেন যে নগেনের কনিষ্ঠ পুত্র ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল! হরেন্দ্রের আর হাসি থামে না। নগেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ছি হরেন, তুমি ছেলে মানুষের মতন কি অর্থহীন হাসিতেছ, আমার ভাল লাগে না।" এতক্ষণে হরেন্দ্রের হাসি থামিল। তিনি বলিলেন "ভাই তুমি যে নূতন কথা শুনালে তাহাতে আমি না হাসিয়া বাঁচি কি ক'রে। জিজ্ঞাসা করি, প্রভাবতীকে কি তুমি দয়া করিয়া ভালবাস? তোমার পিতা পিতামহ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তুমিও তাহাই করিতেছ। প্রভাবতী তোমার পরিণীতা ভার্য্যা, তাহাকে ভাল না বাসিলে আমরা তোমায় কুলাঙ্গার বলিতাম।" হরেন্দ্রের কথা শুনিয়া নগেন হাসিলেন, কক্ষান্তরে প্রভাবতীও হাসিলেন।

নগেন কিছু বলিতে যাইতেছিলেন। হরেন্দ্র তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন "ভাই আমি আর তোমার ভালবাসার কথা শুনিতে চাহি না। কল্য লোক মারফৎ এক হাজার টাকা পাঠাইয়া দিব। এখন আমি বিদায় হলেম।"

নগে। গহনাগুলা কি সে লোকের হাতেই দিব?

"আবার গহনার কথা বলিতেছ, তুমি তো ভারি নির্লজ্জ দেখিতেছি"। এই বলিয়া হরেন্দ্র দ্রুত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এখনও বৃষ্টি পড়িতেছিল। হরেন্দ্র বাহিরে যাইলে প্রভাবতী ফণির হাতে একটী ছাতা দিয়া পাঠাইলেন; ফণি

বাহিরে ছাতি দিতে যাইয়া দেখিল বাঘের ন্যায় একটা কুকুর দাঁড়াইয়া হাই তুলিতেছে—কুকুরটা হরেন্দ্রের সঙ্গে আসিয়াছিল। নগেন কুকুর দেখিলে বিরক্ত হয়েন বলিয়া হরেন্দ্র সেটাকে একটা থাবড়া মারিয়া বাহিরে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, এক্ষণে মনিবকে যাইতে দেখিয়া সে আলস্য ত্যাগ করিতেছিল। ফণি বলিল "কাকা বৃষ্টি পড়িতেছে ছাতা লইয়া যাও।"

"Shut up you little fool" বলিয়া হরেন্দ্র নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।





দ্বাদশ পরিচ্ছেদ



রজনীর আচরণে ফণিভূষণ দিনে দিনে মর্ম্মাহত হইতেছিলেন। তাঁহার আর শ্বশুরালয়ে বাস করিতে ইচ্ছা নাই। এ বিষয়ে তাঁহার মনোভাব হিমালয় বাবুর নিকটে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। রজনীর সুশিক্ষা আদৌ হয় নাই। সে বালিকাকাল হইতে আদরে প্রতিপালিতা হইয়াছে, কখনও শ্বশুরঘর করিল না। শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, স্বামী ইহাঁরা যে তাহার পরম পূজনীয় সে জ্ঞানেরও সম্পূর্ণ অভাব রজনীতে দেখা যায়। বঙ্গ-ললনার পক্ষে ইহাপেক্ষা অধিক লজ্জার বিষয় আর কি আছে। রজনীর ধারণা সে বড়লোকের কন্যা, তাহারা বড়লোক। গরীব লোক মাত্রেই তাহাদের আজ্ঞাবাহী। ফণিভূষণ তাহার কার্য্য-প্রণালীর বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে বা তাহার কোন দোষ দেখাইয়া দিলেই, তাহার অত্যন্ত অভিমান হইত। সে জানিত যে সে তাহার আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিবে, তাহাতে কাহারও কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। হিমালয়বাবুর শ্বশ্রূঠাকুরাণী আবশ্যক অবসর পাইলেই রজনীকে শিক্ষা দেন যে ফণিভূষণ তাহার পিতার আফিসে কর্ম্ম করে। তাহার কোন ক্ষমতাই নাই।

সে অবশ্য রজনীর বাধ্য হইয়া চলিবে। রজনী যে তাহাকে পালঙ্কোপরি স্থান দেয়, ইহাই তাহার সৌভাগ্য। ফণিভূষণ রজনীর আচরণের কথা দুই একবার তাহার শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাঁরা "তাইত বড় অন্যায়, এ সকল কথা ভাল নয়" এই পর্য্যন্তই শাসন প্রণালী দেখাইয়া জামাইবাবাজীকে খুসী করিয়াছেন মাত্র। রজনীকে তিরস্কার করিতে, তাঁহাদের সাহসে কুলাইত না। কারণ রজনী অল্পেই অভিমানিনী। কি জানি, যদি রজনী অভিমানিনী হইয়া অনশনে তনুত্যাগ করে। ইদানিং ফণিভূষণের রজনীর প্রতি আদৌ শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি দুইবেলা আহার করেন, অফিসে যান এবং অধিকাংশ দিন বৈঠকখানা বাড়ীতেই শয়ন করিয়া থাকেন। উপরে শয়ন করিতে যাইবার জন্য বিশেষ কেহ পীড়াপীড়িও করে না। অদ্য হিমালয়বাবু অন্তঃপুরে বসিয়া গৃহিণীর সহিত সাংসারিক কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। ফণিভূষণ শ্বশুরালয় ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। সেই বিষয়েই তাঁহাদের আলোচনা হইতেছিল। হিমালয়বাবু বলিলেন—"ফণি বলিতেছে যে সে কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়া থাকিবে এবং রজনীকেও বাসায় লইয়া যাইবে। গৃহিণী বলিলেন—"সে সুবিধা হবে না, মেয়ের কষ্ট হবে। জামাই কয়টা টাকাই বা মাহিনা পান।"

হিমা। উহার স্ত্রী, ও যদি লইয়া যায় তাহাতে আমাদের বাধা দিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না।

গৃহি। না, সে কিছুতেই হইতে পারে না, মেয়ে আমার তাহলে মরে যাবে।

হিমা। তোমার মেয়ের বড় অন্যায়। ফণি অমন ভাল-মানুষ উহার সহিত মানাইয়া চলিতে পারে না।

গৃহিণী বলিলেন—"হাঁ, ছেলেমানুষ, আর একটু জ্ঞানবুদ্ধি হ'লেই, আপনার সংসার বুঝিয়া লইবে। তখন কি আর ঝগড়া ক'রবে। হিমালয়বাবুর শ্বশ্রূঠাকুরাণী এইবার মাথা-নাড়া দিয়া বলিলেন—"হ্যাগা ওর বয়স কি, উহার কথা কি আবার ধরে নাকি। মেয়েটা আস্ত পাগল।"

এই সময়ে হিমালয়বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুরেশচন্দ্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুরেশবাবু সর্ব্বদাই ব্যস্ত। আসিয়াই পিতাকে বলিলেন, আপনাকে আমায় পাঁচ হাজার টাকা দিতে হইবে।

হিমা। অপরাধ, জরিমানা করিতেছ নাকি?

সুরে। আজ্ঞে সে কথা নয়, কাগজখানা ভাল করিয়া চালাইতে হইলে, আরও কিছু টাকা উহাতে ফেলিতে হইবে। আমি একজন ভাল লেখক পাইয়াছি, সেই জন্য আরও ভরসা করিতেছি।

হিমা। সহসা ভাল লেখক কোথায় পাইলে হে। তোমার কাগজে লিখিবার জন্য বঙ্কিমবাবু কি আবার জন্ম-পরিগ্রহ করিলেন নাকি?

সুরে। ঐ যে আপনাদের কেমন ধারণা যে বঙ্কিমবাবু ছাড়া আর লেখক নাই।

হিমা। হাঁ হে আমরা তো তাই মনে করি।

সুরে। আচ্ছা যাক্ সে কথা, তাহ'লে টাকাটা কতদিনে পাওয়া যাবে।

হিমা। প্রেস বাবদ আর একটী পয়সাও দিব না। কার্য্যারম্ভের সময় তোমায় যে ৫০০০৲ টাকা দিয়াছিলাম, আজও তাহার কোন হিসাব দিলে না।

সুরে। হিসাব দুই একদিনের মধ্যেই দিতেছি, কিন্তু আর পাঁচহাজার টাকা না দিলেই নয়।

হিমা। একটী পয়সাও না।

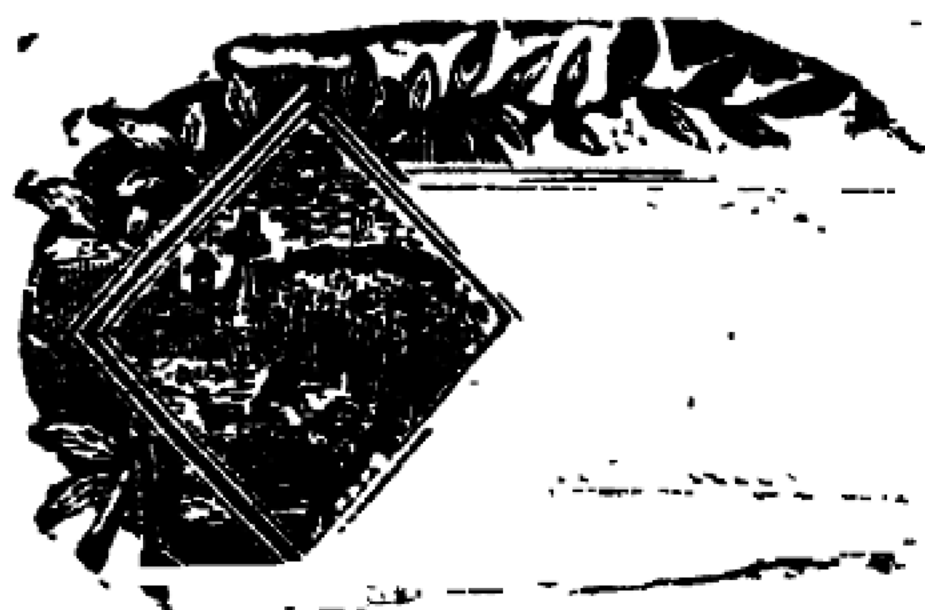
সুরে। দিবেন না।

হিমা। তামা-তুলসী হাতে ক'রে বল্‌তে হ'বে নাকি ?

সুরে। কাগজে কলমে লিখিয়া দিন "দিব না"।

হিমা। কেন, নালিশ কর্‌বে নাকি ?

"দেখিবেন তখন কি করি"। এই বলিয়া অগ্নিমূর্ত্তি সুরেশচন্দ্র তথা হইতে দ্রুত প্রস্থান করিলেন। তাঁহার পদভরে মা বসুমতী অস্থিরা হইয়া পড়িলেন। হিমালয়বাবু ক্রোধে চক্ষুঃ আরক্ত করিয়া গৃহিণীকে বলিলেন—"দেখিলে আজ কালের ছেলেগুলা কিরূপ অসভ্য। উনি আবার কাগজের সম্পাদক, জনসমাজে হিতোপদেশ দিয়া থাকেন।" হিমালয়বাবুর গৃহিণী নীরবে রহিলেন। কিন্তু হিমালয়বাবুর শ্বশ্রূঠাকুরাণী একটা উত্তর না দেওয়া উচিত মনে করিলেন না। তিনি হিমালয়বাবুকে বলিলেন—"বাবা সকল কথায় রাগ করিলে কি হয়। ওর কথা কি আর ধরে বাবা, ও একটা পাগল ছেলে।" পুত্রের আচরণে হিমালয়বাবু অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন। একণে বৃদ্ধার বাচালতা দেখিয়া বলিলেন—"আপনার কন্যার গর্ভটী যে একটী পাগলা-গারদ বিশেষ, তাহা আমার জানা ছিল না।"



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় সুরেশচন্দ্রের মাসিক পত্রিকা কার্য্যালয়। সে কারণে অধিকাংশ সময় তাঁহাকে কলিকাতায় অতিবাহিত করিতে হইত। মধ্যে মধ্যে বাটী যাইতেন। অদ্য প্রাতে সুরেশ বাবু আপন পত্রিকা কার্য্যালয়ে বসিয়া কাজকর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। মাঘ মাস যাইতে চলিল এখনও অগ্রহায়ণ মাসের সংখ্যা বাহির হইল না, সে জন্য কর্ম্মচারিদিগকে তিরস্কার করিতেছিলেন। এই সময়ে একটী ভদ্রলোক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সুরেশবাবু অসাধারণ আড়ম্বরের সহিত করমর্দ্দন করতঃ নবাগত ভদ্রলোকটীর হাত ধরিয়া একটী কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই কক্ষটির দ্বারদেশে লেখা ছিল "প্রবেশ নিষেধ।" সুরেশবাবু বেহারাকে দুই পেয়ালা "চা" প্রস্তুত করিয়া আনিতে হুকুম দিলেন। পরে নবাগত ভদ্র লোকটীকে নানা কথায় আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। সুরেশবাবু বলিলেন, "মহাশয় আপনার সহিত পরিচয়

হওয়াবধি আমি যারপর নাই সুখী হইয়াছি। নবাগত ব্যক্তিও ভদ্রতাপ্রদর্শনে অপারগ ছিলেন না। তিনিও বলিলেন, "আজ্ঞে সেটা উভয়তঃ।"

সুরেশ। মহাশয় আপনি প্রশংসার যোগ্যপাত্র। আপনার প্রশংসা না করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। আপনি যথার্থ উদ্যোগী পুরুষ বটে। আপনার হাত দিয়া এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি অনেকগুলি গ্রাহক পাইলাম। আজ কালের দিনে মাসিক পত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহ করা সোজা কথা নয়।

নবা। সম্প্রতি আবার কয়েকটা বিজ্ঞাপন আনিয়াছি। ইহাতে বেশ দুই পয়সা পাওয়া যাইবে।

সুরেশ। অতি উত্তম। আশা করি আপনি আমার সহায়তা করিলে, আমার কাগজখানি ভাল করিয়া চলিবে। কিন্তু মশাই ইহার ভিতর এক কথা আছে। এ সকল লোক কি রকম, পার্টি ভাল তো—টাকা আদায়ের সময়ে গোলযোগ হইবে না তো। আপনি ভদ্রলোক এ সকল বিষয়ে সবিশেষ না জানিতে পারেন। বিজ্ঞাপন দেওয়ার সময়ে বেশ জলের মতন সরল, কিন্তু টাকা আদায়ের সময়ে একেবারে বেউড় বাঁস। নোয়ালে নোয়ে না, কাটারির দাগ বসে না।

নবা। আমার বোধ হয়, দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা ভাল নয়। নতুবা বুঝুন না কেন যে সকল ব্যবসায়ীকে বিজ্ঞাপন দিয়া তাহাদের ব্যবসা চালাইতে হইবে, বিজ্ঞাপনই যাহাদের ব্যবসায়ের উন্নতির মূল, তাহারা বিজ্ঞাপনের টাকা মারিবে কেন?

সুরেশ। মহাশয়, এ দেশের যে কোন্ অবস্থাটা ভাল তাহা বুঝিতে পারি না। ব্যবসার অবস্থা ঐ গেল। চাঁকুরির অবস্থা সে তো উল্লেখযোগ্যই নয়। সত্তার যেমন তিন অবস্থা, আমাদের চাকুরীরও সেই প্রকার তিন অবস্থা—যথা চাকুরি করিয়া প্রথমতঃ পেট ভরিয়া খাইতে পাই না, দ্বিতীয়তঃ দিবারাত্রি লাঞ্ছনা ভোগ, তৃতীয়তঃ বাজার-দেনা বৃদ্ধি। তারপর জমিদার বাবুদের কথা— বাংলা দেশের জমিদার মহাশয়দিগকে জমিদার আখ্যা না দিয়া প্রজাদিগের পোষ্যপুত্র বলিলেই ভাল হয়।

নবা। সে কি সুরেশবাবু আপনি কি বলিতেছেন?

সুরেশ। মহাশয় আমি ঠিক বলিতেছি। এই দেখুন না কেন,—তাঁহারা জমি ছাড়িয়া দিয়াছেন সে জন্য যাহা তাঁহাদের প্রাপ্য তাহা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করিয়া লইতেছেন, একটী কড়ি কম হইলে প্রজার ঘরে আগুন দিবার হুকুম দিতেছেন। আবার আব্দার দেখুন—আজ জমিদার মহাশয়ের ছেলের বিয়ে—গয়লা, তুমি এক মণ দুধ দাও; জেলেনি সুন্দরী, তুমি দুই মণ মাছ আনিয়া দাও। জমিদারবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র একটী সন্তান উৎপাদন করিয়াছেন, আজ তাহার ষেঠেরা পূজা। ময়রা, তুমি এক মণ মিঠাই দাও। এমন কি জমিদার মহাশয় কোন গৃহস্থের মেয়ের উপর বলাৎকার করিয়া ফৌজদারি মামলায় পড়িয়াছেন, প্রজারা চাঁদা করিয়া টাকা তুলিয়া দাও, তিনি মামলা চালাইবেন। তাই বলিতেছিলাম, এ সকল আব্দার পোষ্যপুত্র ভিন্ন পুত্রেরও চলে না। আমি শীঘ্রই এই বিষয়ে একটা প্রবন্ধ বাহির করিব, ইচ্ছা আছে।

নবা। মহাশয় সাবধান জমিদারদিগের সঙ্গে লাগিবেন না। এখনি ধরে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে যুতিয়া দিবে, কি প্রাণে মারিয়া ফেলিবে।

সুরেশ। মারের ভয়ে লিখিতে ক্ষান্ত হইব? তাহা হইলে আর এডিটারি লাইনে আসিতাম না। সত্য কথা লিখিতে সুরেশচন্দ্র কাহাকেও ভয় করেন না।

নবা। তা বটেই তো—"বীরের তনয় মোরা বীর হনুমান্, সমনে না ডরি, কি ছার সে জমিদার।"

সুরেশ। মহাশয় বিদ্রূপ করিবেন না। আপনি আমার স্পিরিট (spirit) জানেন না।

এই সময়ে বেহারা চা দিয়া গেল। নবাগত ভদ্র-লোকটী চায়ের পেয়ালায় মনোযোগ দিলেন। নবাগত ভদ্রলোকটী আমাদের নগেনের বন্ধু হরেন্দ্র ব্যতীত অপর কেহ নয়। সুরেশবাবু বলিলেন, "দেখুন হরেনবাবু! আপনার সঙ্গে এক্ষণে আমার বন্ধুত্ব হইয়াছে, আর আপনিও আমার মাসিক পত্রিকা খানির উন্নতির জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। আজ আপনাকে কিছু মনের কথা খুলিয়া বলিব। আমার এই কাগজ খানিকে ভাল করিয়া চালাইতে হইলে, দুই একজন ভাল লেখকের প্রয়োজন আছে। আমি একলা আর কতদিকে দেখিব। আমি একজন খুব ভাল লেখকও পাইয়াছি। তবে এক্ষণে তিনি সেরূপ নিয়ম করিয়া আমার কাগজে লিখিতেছেন না। মধ্যে মধ্যে দুই একটা প্রবন্ধ পাঠান মাত্র। বোধ হয় অপরাপর কাগজেও ঐরূপ পাঠাইয়া থাকেন। ইনি খুব ভাল প্রবন্ধ

লিখিতে পারেন। এখন আমার উদ্দেশ্য ইহাকে কোন রকমে হস্তগত করা।

হরে। ইহা অতি উত্তম পরামর্শ। আপনি তাঁহার নিকট যাতায়াত করিয়া আলাপটা জমাইয়া লউন না। আপনার সঙ্গে তাঁহার আলাপ পরিচয় আছে তো। মিষ্ট কথায় সকলেই তুষ্ট।

সুরে। না মহাশয়, আমার সহিত এখনও তাঁহার একদিনও দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি আপন নাম ধাম লিখিয়া প্রবন্ধগুলি পাঠাইয়া দেন। আমিও পত্রিকা প্রকাশ হইলে এক কাপি উহার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়া থাকি।

হরে। তবে শীঘ্র আলাপ করিয়া ফেলুন, না হয় আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলুন। আলাপ জমাইয়া ফেলিতেছি।

সুরে। না হরেন্দ্র বাবু, ওভাবে কার্য্য করিলে হইবে না। আমি কিছু পাকাপাকি রকমের ব্যবস্থা করিতে চাই। অবশ্য তাহাতে আমাকে কিছু স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। আমি মনে করিতেছি তাঁহাকে বিবাহ করিব।

হরে। মহাশয়, আমি আপনার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না—বিবাহ করিবেন কাহাকে?

সুরে। আমি যে লেখকের কথা বলিতেছি, তিনি স্ত্রীলোক।

হরে। তাই বলুন, আপনি অন্তরা না ভাঙ্গিলে কি করিয়া বুঝিব। বা বেশ ইহা অতি উত্তম পরামর্শ দেখিতেছি। আমরা অবশ্য বরযাত্র যাইব। কিন্তু মহাশয় আপনি যে বলিলেন, তাঁহার সহিত আপনার এখনও দেখা

সাক্ষাৎ হয় নাই। তাঁহার বিশেষ কোন পরিচয়ও আপনি জানেন না। হইতে পারে তাঁহার উদ্বাহ কার্য্য অনেক দিন হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে কি হইবে। আপনি কি তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী হইতে ইচ্ছা করিতেছেন।

সুরে। তাঁহার শুভপরিণয় এখনও সম্পন্ন হয় নাই। তিনি দেখিতেও পরমা সুন্দরী।

হরে। এ সকল কি আপনি খড়ি পাতিয়া জানিয়াছেন?

সুরেশবাবু কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "মহাশয় আপনাকে মিথ্যা বলিয়া আমার লাভ কি। আচ্ছা ওকথা এখন থাক্, আপনি তাঁহার রচনা শুনিবেন?" এই বলিয়া সুরেশচন্দ্র জামার পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া হরেন্দ্রকে রচনা শুনাইতে লাগিলেন। বলিলেন,—"বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিয়া যান। দেখুন কি পরিপুষ্ট ভাব, কি মিষ্ট লেখা—

"তোরা বল্‌গো দূতী কোথা গেলে তারে পাই।"
"যার কথা, হ'লে কোথা।"
"কাণ পেতে থাকি সেথা।"
"পথে ঘাটে দেখা হ'লে চুরি করে চাই॥"

এই কয়েকছত্র কবিতা পাঠ করিয়া সুরেন বাবু বলিলেন, "কিরূপ মিষ্ট লেখা একবার দেখুন।" হরেন্দ্র—তাইত; দেখি দেখি বলিয়া কাগজখানি ভাব মুগ্ধ সুরেশচন্দ্রের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া একেবারে গরম চায়ের পেয়ালায় ডুবাইয়া ধরিলেন। সুরেশচন্দ্র লম্ফ ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক "কি করেন কি করেন" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। হরেন্দ্র

বলিলেন,—“মহাশয় চায় চিনি বড় কম হইয়াছে। আপনি বলিলেন ইহা বড় মিষ্ট, তাই একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলাম।” সুরেশচন্দ্র কাগজখানি হরেন্দ্রের নিকট হইতে ফিরাইয়া লইয়া উহা শুষ্ক করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন এবং একটু বিরক্তি সহকারে বলিলেন, “হরেন্দ্রবাবু! আপনার সমুদায় ভাল। কিন্তু ঐ যে মাঝে মাঝে কেমন একটু ছিট্ দেখিতে পাওয়া যায়।”—

হরে। মহাশয় আমার এ কাঁচা ছিট্। জলকাচা করিলেই উঠিয়া যায়। কিন্তু আপনি যে এক নম্বরের কেম্ব্রিক ছিট্ সকল দেখাইতেছেন।

সুরে। কেন, কেন মহাশয়! আপনি কি জন্য এরূপ বলিতেছেন?

হরে। মহাশয়, আপনি বলিতেছেন যে সে স্ত্রীলোকটীকে আপনি কখনও দেখেন নাই। তাহার বয়স কত, দেখিতে কেমন, বিবাহিতা কি না, আপনাদের সহিত বিবাহ হইতে পারে কি না, এ সকল বৃত্তান্ত আপনি কিছুই জানেন না। অথচ বলিতেছেন, তাহাকে বিবাহ করিবেন।

সুরে। আপনাকে যতটা বুদ্ধিমান্ ভাবিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি তাহা নয়। মহাশয় ঘোম্‌টা দেখিয়া জানিতে হইবে কাদের কুলের বৌ। নতুবা কুলবধূ কি ঘোম্‌টা উন্মোচন করিয়া আপনাকে তাহার মুখচন্দ্রখানি দেখাইবে। তবে আপনি জানিবেন, অমুকচন্দ্রের স্ত্রী জল আনিতে যাইতেছেন। রচনা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন না—বিবাহিতা কি না. দেখিতে কেমন? আর বয়সের কথা বলিতেছেন “এই

দেখুন কি নাম লেখা রহিয়াছে"। হরেন্দ্র কাগজখানি লইয়া দেখিলেন প্রবন্ধটীর নিম্নে লেখা রহিয়াছে—শ্রীমতী * ষোড়শী-বালা দেবী। ৯০২ মিছারাম চক্রবর্ত্তীর লেন।

সুরে। কেমন এক্ষণে বয়স কত, দেখতে কেমন, সব বুঝ্‌লেন তো। আপনার আর কি সন্দেহ আছে, জিজ্ঞাসা করুন!

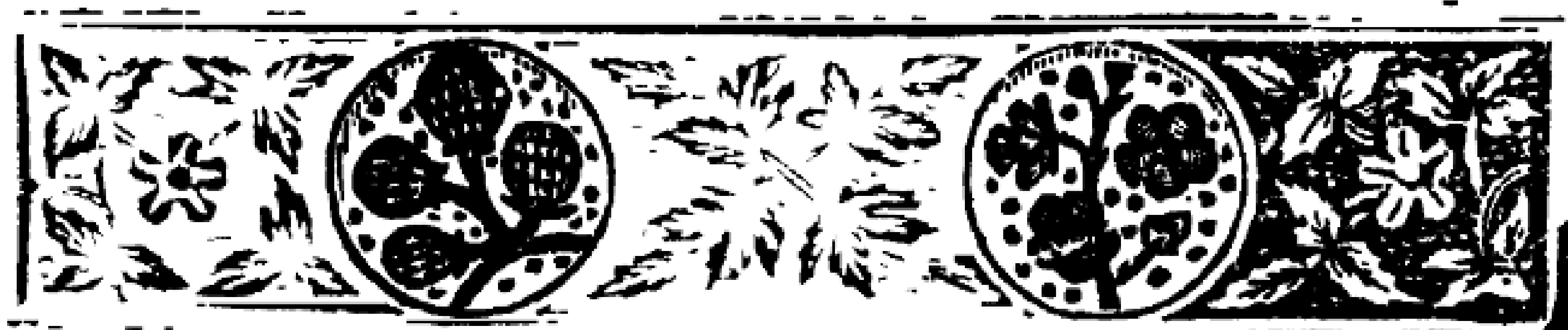
হরে। মহাশয় আমার আর কোনরূপ সন্দেহ নাই। আমি পরিষ্কার বুঝিয়াছি—আপনি তাঁরে এখনও চোখে দেখেননি, শুধু বাঁশী শুনিয়াছেন। উত্তম, আপনি একজন প্রেমিক বটেন। তা'হলে আপনি উহার সহিত পরিচিত হইতে কবে যাইবেন?

সুরে। "Do it now" অদ্যই অপরাহ্নে যাইব।

হরে। উত্তম! আমি তবে এখন আসি।



* কালী তারা প্রভৃতি দশ মহাবিদ্যান্তর্গত এক মহাবিদ্যা।



চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ঐ দিবস অপরাহ্নে বেশভূষা সমাধা করিয়া সুরেশচন্দ্র তাঁহার ধ্যানেগড়া ছবী ষোড়শীবালা সম্ভাষণে চলিয়াছেন। সুরেশচন্দ্র বেশ মনের আনন্দেই পথ অতিক্রম করিতেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ কয়েকটী দুশ্চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, তিনি এক অপরিচিতা অজ্ঞাতকুলশীলা, কামিনীর প্রেম সম্ভাষণে যাইতেছেন; কিন্তু যদি সেই মনোমোহিনী প্রিয় ভাষায় তাঁহাকে সম্ভাষণ না করে। যদি সে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে কি হইবে? কিয়ৎকাল চিন্তার পর সুরেশচন্দ্র উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"কি হইবে? বুঝাইয়া বলিব আমি তাহাকে কত ভালবাসি। বলিব সুলোচনে! আমি তোমায় বৎসরে তিনশত পঁয়ষট্টি দিন ভালবাসিব। তুমি আমায় কেবলমাত্র শনিবারে রবিবারে ভাল বাসিও। বলিব চন্দ্রাননে! আমি তোমায় অন্তরের সহিত ভালবাসিব, তুমি কি আমায় একটু লোক-দেখান ভাল-বাসিতে পারিবে না। ইহাতেও যদি সে সুন্দরী করুণা

দানে কৃপণতা করে, তখন সেই আলতাপরা টুকটুকে পা-দুখানি ধরিয়া বলিব "প্রিয়ে তুমি আমার নবঘন, আমি তৃষিত অভাজন, আমায় বারিদানে বঞ্চিত করিও না।"

এইরূপে "জনকজননীর" সম্পাদক মহাশয় নানা চিন্তা করিতে করিতে একখানি ক্ষুদ্র একতালা বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটু ইতস্ততঃ করতঃ সুরেশচন্দ্র কড়াধ্বনি করিয়া ডাকিলেন "বাটীতে কে আছে গা?" ক্ষণকালের মধ্যে এক বালক আসিয়া দ্বার উন্মোচন করিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কাহাকে খুঁজিতেছেন?"

সুরে। ষোড়শীবালা দেবী কি এই বাটীতে থাকেন?

"আজ্ঞে হাঁ। ভিতরে আসুন" এই বলিয়া বালক সুরেশচন্দ্রকে ভিতরে লইয়া গিয়া একখানি অপেক্ষাকৃত ছোট কামরায় বসিতে দিল।

অনতিবিলম্বে এক রমণী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। এই রমণীর বয়ঃক্রম অনুমান পঞ্চাশ বৎসর হইবে। দেহখানি কিঞ্চিৎ স্থূল, মুখাকৃতি গোলছাঁচের। কেশগুলি কতক কতক পাক ধরিয়াছে। মাথার মাঝে ঘুঘুড়ির চড়ার ন্যায় বেশ একটী লম্বা চওড়া টাক পড়িয়াছে। পরিধানে একখানি আধময়লা আট হাতি পাছাপেড়ে নীলাম্বরী ছিল। কাপড়খানি তাঁহার নাতিনীর। তাঁহার কাপড় ভিজা থাকায় নাতিনীর ঐ কাপড়খানি পরিধান করিয়া তিনি গৃহকর্ম্ম করিতেছিলেন। এক্ষণে সুরেশচন্দ্র সম্মুখে সেই অপূর্ব্ব রমণী-মূর্ত্তিটীকে দেখিয়া বলিলেন "একবার ষোড়শীবালা দেবীকে আসিতে বলনা গা?"

রমণী। আপনার কি প্রয়োজন। কোথা থেকে আসিতেছেন ?

সুরে। আমি "জনকজননী" কার্য্যালয় হইতে আসিতেছি। আমি উক্ত মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। তুমি একবার তাঁহাকে ডাকিয়া দাও। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

রমণী। আপনার কি প্রয়োজন নিবেদন করুন। আমারি নাম ষোড়শীবালা দেবী।

সুরে। অসম্ভব, তোমার বাচালতা অমার্জ্জনীয়। দাসী হইয়া আমার সহিত পরিহাস করিতে আইস। এখনি তোমার মনিবকে সকল কথা বলিয়া দিব জান ?

রমণী দেখিলেন বিপদ বড় মন্দ নয়। সন্ধ্যাবেলা কোথা থেকে এ বালাই ম'র্ত্তে এলো। তিনি যে ষোড়শীবালা তাহা সুরেশ বাবু কিছুতেই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। অবশেষে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন "মহাশয়, আপনার সহিত অধিকক্ষণ আলাপ করিবার আমার অবসর নাই। আমি রান্না ফেলিয়া আসিয়াছি, আপনার প্রয়োজনের কথা শীঘ্র বলুন, নতুবা আমি আপন কার্য্যে চলিলাম।"

সুরে। ও তাই বল তুমি এ বাড়ীর রাঁধুনি। বেশ বেশ, এই নাও দুইটা টাকা জল খাইও। এখন একবার তোমার মনিবকে ডাকিয়া দাও।

সুরেশচন্দ্রের কথা শুনিয়া রমণী আর হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন সম্পাদক মহাশয়! আপনি কি বাঙ্গালাভাষা বোঝেন না "আমিই এই বাড়ীর মনিব। আপনার প্রয়োজনের কথাটা শীঘ্র বলিয়া আমাকে ছুটি

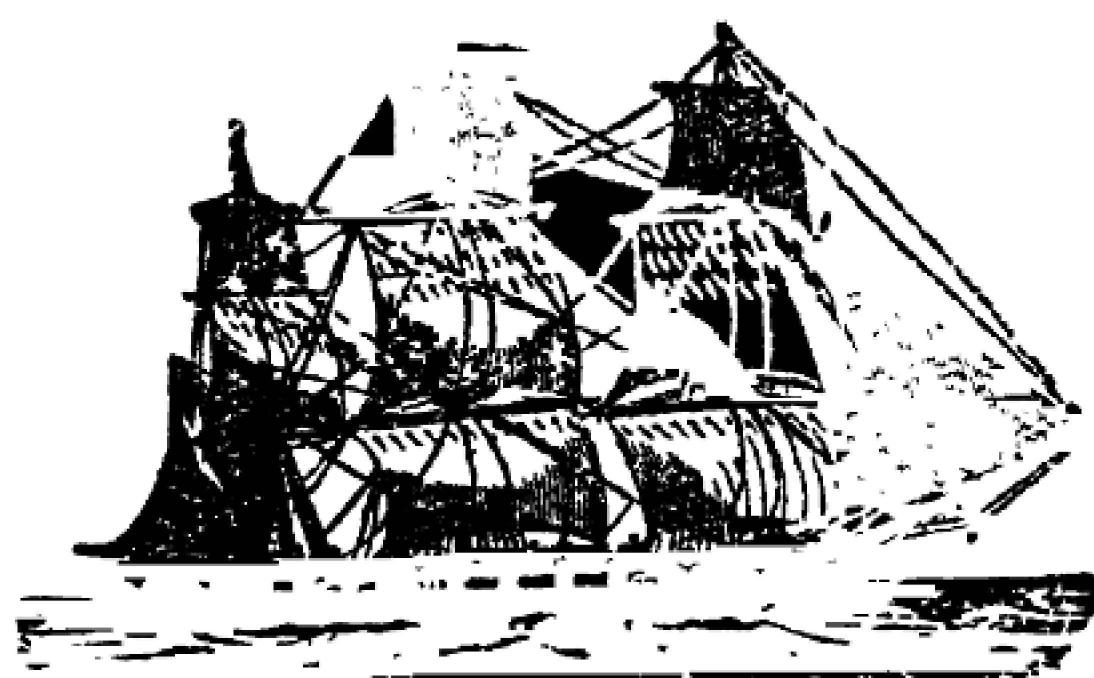
দিন। এইবারে যে প্রবন্ধটী পাঠাইয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছেন কি?

এইবারে সুরেশচন্দ্রের স্বপ্ন ভাঙ্গিল। তিনি যে পাহাড়ে ভ্রম করিয়াছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন। সুরেশচন্দ্র হতাশভাবে চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িলেন। আবার তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হইয়া লাফাইয়া উঠিয়া, বলিতে লাগিলেন,—"আমার সেই ধ্যানে গড়া ছবী ষোড়শীবালার বয়স চুয়ান্ন বৎসর, পক্ক কেশ, ঘুমুড়ির চড়ার মতন মাথার মাঝে টাক—ধিক্ আমার কল্পনাশক্তি। পাপিষ্ঠা তুমি গোল্লায় যাও, সৃষ্টি এখনি রসাতলে যাক্।" এই বলিয়া সুরেশচন্দ্র তথা হইতে বেগে প্রস্থান করিলেন। তিনি এরূপ বেগে এবং জ্ঞানশূন্য হইয়া ধাবিত হইয়াছিলেন, যে প্রস্থানকালে গৃহদ্বারের চৌকাটে তাঁহার মাথা লাগিয়া রক্তপাত হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি পূর্ব্ববৎ বেগে চলিতে লাগিলেন।

সুরেশবাবুর ভাবগতিক ও হস্তপদ সঞ্চালন দেখিয়া রমণী কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিস্তব্ধা হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমটা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার মনে হইতেছিল যে এ আবার কি রহস্য। কিন্তু ক্রমে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বাবুটীর ব্যায়রাম কি—মনে মনে হাঁসি আসিল। আবার সুরেশচন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া দুঃখও হইতে লাগিল। কিন্তু সুরেশচন্দ্রের দুঃখ মোচন করিবার তাঁহার হাত ছিল না।

এই বর্ষীয়সী রমণী শিক্ষিতা ছিলেন। লিখিতে পড়িতে জানিতেন। ইঁহারা ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত। ইনি অন্যান্য মাসিক

পত্রিকায়ও তাহার রচনা সকল পাঠাইতেন এবং দুই এক-খানি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও লিখিয়াছিলেন। এক বিধবা কন্যা এবং তাহার দুইটী পুত্র কন্যা লইয়া ইঁহার সংসার। ষোড়শীবালার যে চুয়ান্ন বৎসর বয়স হইতে পারে, ইহা যৌবন-উদ্‌ভ্রান্ত সুরেশচন্দ্রের ধারণায় আসে নাই। যাহা হউক এই ব্যাপারে সুরেশচন্দ্র অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। তিনি এ শোক সামলাইতে পারিলেন না। বাটি আসিয়া সুরেশবাবু শয্যা গ্রহণ করিলেন। রাত্রে তাঁহার খুব জ্বর ফুটিয়া উঠিল।





পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আমাদের রসের ঠাকুরদা পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর নাই শুনিয়া বোধ হয় পাঠক মহাশয় যারপর নাই দুঃখিত হইবেন। কিন্তু উপায় নাই। কালের কঠিন নিয়ম লঙ্ঘন করা কাহারও সাধ্য নয়। সময় উপস্থিত হইলে যাইতে হইবে! ঠাকুরদার সময় উপস্থিত হইয়াছিল। একদিন ডাক পড়িল—ঠাকুরদা চলিয়া গেলেন। আজ প্রায় চারি পাঁচ মাস হইতে চলিল ঠাকুরদা এই জরাজীর্ণ অনিত্য সংসারধাম ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন! তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান, বড়রাণী ও ছোটরাণী এক্ষণে একপ্রকার নিরাশ্রয়া। তাহাদের কি হইবে, কিরূপে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন চলিবে এই ভাবনায় বোধ হয় তাঁহাকে নিত্যধামে থাকিয়াও বিচলিত হইতে হইতেছিল। কিন্তু যাঁহার ভাবনা, পরমদয়াল সেই পরমেশ্বর ভাবিতেছেন এবং উপায়ও করিয়া দিয়াছেন। যোগেশ চক্রবর্ত্তী নামক একজন ক্রিয়াবান্ ধনাঢ্য ব্যক্তি ক্রোশগ্রামের আড়পারে বাস করিতেন। তাঁহার ভবনে বারমাসে তের পার্ব্বণ হইত। তাঁহাদের কুলপুরোহিত সে সকল কার্য্য করিতেন তাঁহার অনুপস্থিতিকালে ঠাকুরদা মাঝে

মাঝে তাঁহাদের বাটীতে লক্ষীপূজা, মনসাপূজা, প্রভৃতি কার্য্য সকল করিতেন। যোগেশবাবু অতিশয় দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ঠাকুরদার হঠাৎ মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া এবং তাহার পরিবারবর্গের দুরবস্থার কথা তাঁহার স্ত্রীর নিকটে অবগত হইয়া, বিধবাদ্বয়ের ভরণ-পোষণার্থে মাসিক দশটাকা করিয়া পাঠাইয়া দিতেন।

ঠাকুরদার আপন গ্রামের লোকের মধ্যে কেহ কিছু দিয়া সাহায্য করা দূরের কথা, তোমরা কেমন আছ বলিয়া কেহ তত্ত্বও লইতেন না। কথা কহিলেই পাছে টেক্স দিতে হয়, এই ভয়ে আরও কেহ কোন খবর লইতেন না। কারণ কেমন আছ কি করিতেছ জিজ্ঞাসা করিলেই তাঁহারা শুনিবেন যে বড় কষ্ট, দিন চলে না, খাইতে পাইতেছি না। তাহা হইলেই পারগের পক্ষে কিছু দিয়া সাহায্য করা উচিত। কাজ কি অত গোলযোগে। তাহাপেক্ষা খবর না লওয়াই উত্তম। যাহা হউক সে জন্য ইহাদের অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হয় নাই। তাঁহাদের স্বকীয় পরিশ্রমের ফলে এবং যোগেশ বাবুর কৃপায় গ্রাসাচ্ছাদন এক প্রকার চলিয়া যাইতেছিল। এক্ষণে উভয় রাণীতে আর বাদবিসম্বাদ হয় না। বরঞ্চ পরস্পরে সকল কার্য্যে পরস্পরের সহায়তা করিয়া থাকেন। যাঁহাকে লইয়া তাহাদের ঝগড়া, তিনি সরিয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং ইহাঁরাও রণাবসান করতঃ সন্ধি-স্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে উভয়ে পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্য করিতেন না। আসল কথা অন্নচিন্তা করিতে হইলে, তুচ্ছ বিষয় লইয়া বিবাদ করিবার অবসর থাকে না।

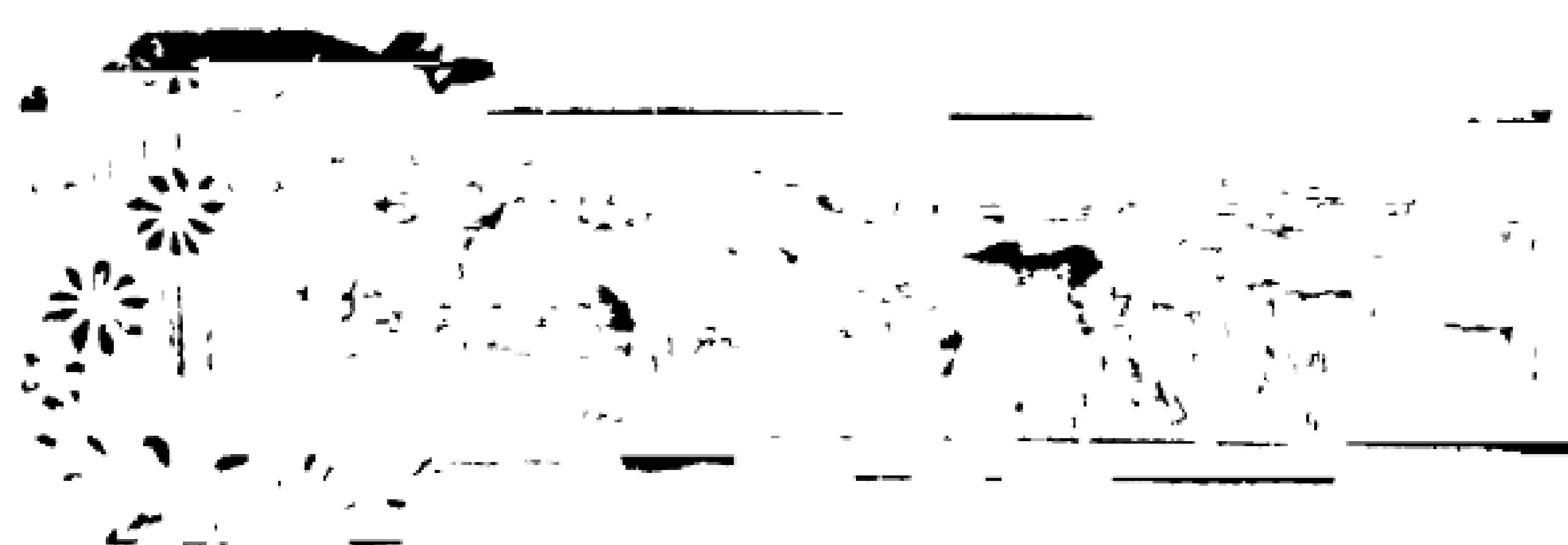
ঠাকুরদা থাকিতে হিমালয় বাবুদের বাটীতে ইহাদের পরস্পরের যাতায়াত ছিল। এক্ষণে আরও কিছু বাড়িয়াছিল। বড়রাণী, ছোটরাণী, উভয়েই অবসর পাইলে এক্ষণে হিমালয় বাবুদের বাটীতে আসিয়া কালাতিপাত করিতেন এবং গৃহস্থের এটা, সেটা কার্য্যও করিতেন। হিমালয় গৃহিণীও তাহাদের কখন বা ভাল মন্দ সামগ্রী দিয়া, কখন বা মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতেন। বড়রাণী গৃহিণীর নিকট থাকিতেন, ছোটরাণী অধিকাংশ সময় রজনীর নিকটে থাকিতেন। ছোটরাণীর আসল নাম সৌদামিনী। আমরা এখন হইতে ইহাকে সোদামিনীই বলিব।

সৌদামিনী রজনীর সহিত গল্প করেন, তাহার চুল বাঁধিয়া দেন এবং যৌবন সুলভ আমোদ আহ্লাদও করিয়া থাকেন। কিন্তু রজনী লক্ষ্য করিতেছিল, যে সৌদামিনী তাহার সহিত গল্পগুজব কালে বা হাস্য পরিহাস কালে অধিকাংশ সময়ে ফণিভূষণের প্রসঙ্গ আনিয়া উপস্থিত করে।

আজ হিমালয় বাবুদের পাচকের বড় জ্বর হইয়াছে। সৌদামিনী আগুয়ান হইয়া রন্ধন কার্য্য করিয়াছেন এবং মাথায় কাপড় দিয়া পরিবেশনও করিতেছিলেন। গিরিবরের পুত্র পৌত্র সকলে আহারে বসিয়াছেন, ফণিভূষণও আহারে বসিয়াছিলেন। রজনী একপার্শ্বে বসিয়া তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে খাওয়াইয়া দিতেছিল, ফণিভূষণ বাটির জামাই বলিয়া বোধ হয় সৌদামিনী তাহাকে কিছু পরিপাটীরূপে আহারীয় সামগ্রী সকল সাজাইয়া দিয়াছিল। অনেক দিবস হইল ফণিভূষণকে কেহ এরূপ যত্ন করিয়া খাওয়ায় নাই এবং

এরূপ সুমিষ্ট পাকও অনেক দিন হইল গিরিগুহায় হয় নাই। ফণিভূষণ বিবাহের পর প্রথম যে দিবস শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার সেই পুরাতর্ম স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। সেই দিন তাঁহার শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ তাঁহাকে এই-রকম করিয়া আহার করাইয়া ছিলেন। আহার সকলের প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। সৌদামিনী হেঁট হইয়া ফণিভূষণের পাতে পায়েস দিতে ছিলেন, ফণি আর নয় আর নয় বলিয়া পাতে দুই হাত নাড়িতেছিলেন—একটী দীর্ঘ নিশ্বাসের উত্তপ্ত বায়ু ফণিভূষণের কপালে লাগিয়া ফোস্কা পড়িবার ন্যায় জ্বালা করিয়া উঠিল। ফণিভূষণ মুখ তুলিয়া দেখিলেন নূতন পাচিকা, নিরুপম রূপ। তৎক্ষণাৎ মাথা হেঁট করিয়া আবার তিনি আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সকলেই দেখিতে পাইল ফণিভূষণ অনন্যমনে খানিকটা লবণ লইয়া পায়েসে মাখিয়া গ্রাস মুখে তুলিলেন। সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। এই ব্যাপারে কেবল হাসিল না রজনী। ফণিভূষণের জ্যেষ্ঠ শ্যালক নরেশ বলিলেন "কি হে ফণি! নূতন রকমের নবাবী খানা কোথা হইতে শিখিয়া আসিলে।" ফণি অপ্রস্তত হইয়াও হইবে না, বলিল "নূন দিয়া পায়েস কখন খান নাই তো, বড় মিষ্ট লাগে।"





ষোড়শ পরিচ্ছেদ

—०:*:०—

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। হিমালয় বাবুর বাটিস্থ সকলেই নিদ্রাদেবীর আরাম-ক্রোড়ে বিস্মৃতির গর্ভে নিমগ্ন। নিদ্রা নাই কেবল রজনীর। দুগ্ধফেণনিভ কোমল শয্যায় শয়ন করিয়াও রজনীর আজ নিদ্রাকর্ষণ হইতে ছিল না। রজনী আজ চিন্তামগ্না। সে বারে বারে মনে বল সঞ্চয় করিয়া তাহার অমূলক চিন্তাস্রোতকে ফিরাইবার প্রয়াস পাইতেছিল; কিন্তু সেই সকল চিন্তাই বারে বারে তাহার মনোমধ্যে উদয় হইয়া, তাহাকে জ্বালাতন করিতেছিল।

চিন্তাব্যাধিগ্রস্থা রজনী "তাও কি সম্ভব, না তাহা কখনই হইতে পারে না" বলিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া বসিল। আবার কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিল "অসম্ভব বা কি জন্য মনে করিতেছি। সৌদামিনী যৌবনে বিধবা হইয়াছে। তাহার সেরূপ অভিভাবক নাই। উনিও দেখিতেছি আজ মাসাবধি উপরে শয়ন করিতে আসেন না। আমার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। স্বীকার করি আমার

দোষ। কিন্তু সে দোষ তো আমার চিরকালই আছে। সে জন্য তিনি কখন আমার উপর বিরক্তি ভাব প্রকাশ করেন নাই বা আমার সহিত বাক্যলাপ বন্ধ করেন নাই। এবারে তাঁহার কিছু ভাবান্তর দেখিতেছি। অবশ্য ইহার কিছু মানে আছে।" সকালবেলার ঘটনা রজনীর মনে হইল। রজনী আর ভাবিতে পারিল না। ফণিভূষণ কি তবে সৌদামিনীকে ভালবাসিয়াছে? একথা মনে করিতে রজনীর বড় কষ্ট হইতেছিল। রজনী শয্যা ত্যাগ করিয়া সেই রাত্রে নিম্নতলে অবতরণ করিল এবং অন্দরের দিক্ হইতে একটী কপাট উন্মুক্ত করিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল।

গৃহমধ্যে একটী টেবল্-ল্যাম্প ক্ষীণ ভাবে জ্বলিতেছিল। ফণিভূষণ জাগ্রত ছিলেন। তাঁহাকেও আজ নিদ্রাদেবী আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। আজ প্রাতে আহারে বসিয়া তিনি যে রূপরাশি দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই রাক্ষসী তাঁহার হৃদয় লইয়া খেলা করিতেছিল। কিন্তু ফণিভূষণ চরিত্রবান যুবাপুরুষ ছিলেন। তিনি ভগবৎপদে আত্মবিপদ জানাইয়া বল প্রার্থনা করিতেছিলেন। ফণিভূষণ যুক্তকরে মনে মনে বলিতেছিলেন—"দয়াময় রক্ষা করিও, এমন মতি যেন না হয়"। বোধ করি দয়াময় হরি, ফণিভূষণের ঐকান্তিক কাতর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া, সময়ে রজনীর মতি ফিরাইয়া, তাহাকে রাত্রি দ্বিপ্রহরে ফণিভূষণের উদ্ধারের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ফণিভূষণ সৌদামিনীর চিন্তা করিতেছিলেন—এই সময়ে হঠাৎ সেই কক্ষমধ্যে রজনী প্রবিষ্ট হওয়ায়, তাঁহার মনে হইল বুঝি সৌদামিনী আসিল। তিনি অস্ফুটস্বরে

বলিয়া উঠিলেন—"কে সৌদামিনী, তুমি এখানে কেন, ছি, ছি!" উত্তর হইল "তুমি যে আসিতে বলিয়াছিলে।" "কখন নয়, মিথ্যা কথা" বলিয়া ফণিভূষণ একটু উত্তেজিতভাবে উঠিয়া বসিয়া দেখিলেন সৌদামিনী নয় রজনী।

ফণি। এতরাত্রে রজনী তুমি এখানে কি মনে করে।

রজনী। এতরাত্রে তুমিই বা সৌদামিনীকে এখানে প্রত্যাশা করিতেছিলে কি মনে করে।

রজনীর বাক্যে ফণিভূষণ কিছু অপ্রতিভ হইলেন। রজনী বলিল "উপরে চল"।

ফণি। আজ হঠাৎ এমন বদখেয়াল হইল কেন? উপরে যাইবার জন্য তো কখনও বলিতে আস নাই।

"সত্য আসি নাই। আমার সহস্র অপরাধ হইয়াছে। তুমি আমায় ক্ষমা কর।" এই বলিয়া রজনী স্বামীর পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। কান্নার বেগ কিছু হ্রাস হইলে রজনী বলিল—"আমি অতি অভাগিনী, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। তুমি আমায় ক্ষমা না করিলে আমার উদ্ধার নাই।"

ফণিভূষণ রজনীকে তুলিয়া শয্যার উপরে বসাইয়া বলিলেন "ক্ষমা, তোমায় অনেক দিনই করিয়াছি।" ফণিভূষণ বুঝিয়াছিলেন রজনী অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে। কিন্তু হঠাৎ এমন কি ঘটনা হইল, যে রজনী এই রাত্রেই এখানে আসিল—ইহা ফণিভূষণ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না তিনি রজনীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

রজনী। উপরে চল

ফণি। আজ আর যাইব না। আর উপরে যাব কি যাব না, সে কথা কাল তোমায় বলিব।

রজনী। তোমার কথার মানে কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

ফণি। তবে শুন, আমার ইচ্ছা তোমাকে লইয়া কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়া থাকিব। তুমি আমার সহিত যাইতে প্রস্তুত আছ কি ?

রজনী। তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।

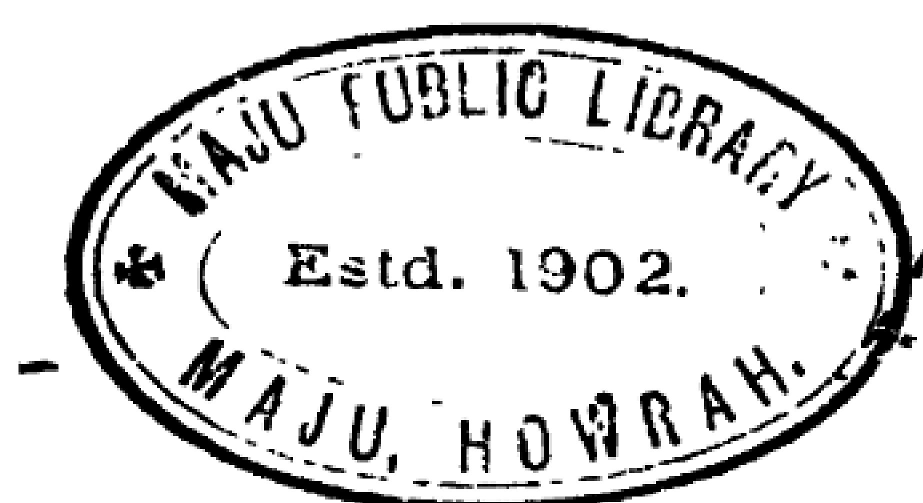
ফণি। উত্তম, তবে এখন উপরে যাইয়া শয়ন করগে, আমিও একটু নিদ্রা যাইবার চেষ্টা দেখি।

ফণিভূষণ আজ একান্ত উপরে আসিবেন না বুঝিয়া, অগত্যা রজনী সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া উপরে অসিল। বিচিত্র নারী চরিত্র। গরবিনী বালা বিবাহাবধি, যাহাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া আসিয়াছে, যাহার কখনও কোন খবর লওয়া প্রয়োজন মনে করে নাই, আপনার মানাভিমান লইয়া আপনি উন্মত্ত ছিল, আজ তাহার সেই হেলার সামগ্রী অন্য রমণীতে আসক্ত এই সন্দেহের ছায়া অনুভব করিবা মাত্র, হৃদয় মধ্যে বিষের জ্বালা অনুভব করিতেছিল। সে রাত্রে রজনীর আর শয়ন করা হইল না। এক বার উপরে, এক বার নীচে, কখনও বা বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া সারা নিশি এক প্রকার ফণিভূষণের পাহারায় যাপন করিল। ভয়—কি জানি, যদি বিদ্যুৎ চমকায়।

এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে ফণিভূষণ রজনীকে লইয়া কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিল। রজনীও বিনা আপত্তিতে

কলিকাতায় আসিয়া রহিল। ফণিভূষণ যে সৌদামিনীর চোখের আড়াল হইলেন, ইহাতে রজনী শান্তিলাভ করিল। সৌদামিনীরও এক নম্বরের ফাঁড়া কাটিয়া গেল।







সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

আজ মধুবার অর্থাৎ সখের শনিবার। মধুমাসে মুরারীর মধুনাম গান হইয়া থাকে। আর মধুবারে হিমালয়চন্দ্রের ন্যায় বাবুদিগের মদ্য পান হইয়া থাকে। আজ হিমালয় বাবুর বৈঠকখানা গুলজার। গয়, গবাক্ষ, নল, নীলের ন্যায় মহানুভব পারিষদবর্গ, তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন। কেহ বলিতেছেন, যে সোণার লঙ্কা তিনি এক দিনেই ছার খারে দিতে পারেন। তবে তিনি মধুবনের প্রয়াসী। কেহ বা তাঁহার হনুমান-বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর বাহির করিয়া এক ছত্র গাহিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন এবং কণ্ঠশুষ্ক বোধ করিলে লালপানির সাহায্যে তাহা ভিজাইয়া লইতেছিলেন। হিমালয়বাবু আহ্লাদে আটখানা হইয়া সট্‌কায় ধূমপান করিতেছেন। এমন সময়ে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত পশুপতি বাবু রঙ্গালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পশুপতিকে হাঁপাইতে দেখিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হে পশু! তুমি যে গলদঘর্ম্ম হইতেছ, ব্যাপার কি ?"

পশু। আবার সেই কথা, খবরদার বজ্রুচি মুখ সামলাইয়া কথা কও, নতুবা তোমার একদিন কি আমার একদিন।

হিমালয়বাবু তাঁহার বন্ধুবর্গের বিবাদ মিটাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি ব্যাপার হে পশুপতি! তোমাকে দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন কিছু খবর আছে।"

পশু। বিলক্ষণ খবর আছে মশাই। খবরের একেবারে চৌদ্দপুরুষ আছে। এখন বক্‌সিস কি দিবেন, তাই বলুন।

বন্ধু। জুলজিক্যেল গার্ডেনটা তোমায় দেওয়া যাবে। তুমি ছেলে পুলে নিয়ে সপরিবারে সেখানে বেশ থাকবে। এইরূপ বক্‌সিসের কথায় পশুপতি অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে জনৈক বন্ধু এক গ্লাস লালপানি তাঁহার সম্মুখে ধরায় পশুপতি দন্তপংক্তি বাহির করিয়া বলিলেন "দেখ দেখি ভাই! আমার সঙ্গে মিছামিছি লাগা কেন?"

দ্রব্যগুণে পশুপতির হৃদয়ের কবাট খুলিয়া গেল। তিনি হিমালয় বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"মশাই লোকে মনে করে, যে ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও জানিতে পারে না।"

হি। ব্যাপারটা কি বল না ছাই।

পশু। মশাই আমার নাম পশুপতি বসু—আমার পাছায় যে দুটি আঁখি আছে, তা তো আর লোকে জানে না।

হি। বেশ তোমার পাছায় আঁখি আছে, মুখে গুহ্যদ্বার আছে, সব আমরা স্বীকার করে নিলাম। এখন ব্যাপার খানা কি তাই বল?

পশু। আজ্ঞে ব্যাপার আর কি। এই ঠাকুরদার সেই বিষফোড়াটার কথা বলছিলাম।

এই কথায় হিমালয় বাবুর জনৈক বন্ধু বলিয়া উঠিলেন "ও সেই পুরান-কথা—তোমায় দেখে ঘোমটা দেয় না?"

পশু। আজ্ঞে সে কথা নয়। তদপেক্ষা গুরুতর। প্রেমের সবমেরিন (Submarine) বেরিয়েছে। পঞ্চানন নামক রণতরী খানি (Cruiser) ভবার্ণব হইতে অন্তর্হিত হওয়ায়, ইষ্ট কোষ্ট (East Coast) থেকে যোগেশ নামে প্রেমের সবমেরিন খানি সৌদামিনী নাম্নী গুডস্ ভেসল্ (Goods Vessel) খানিকে টরপেডো (Torpedo) করবার চেষ্টা ক'চ্ছে। হরিদাসী নাম্নী Wireless telegraphic যন্ত্র দ্বারা এ সকল কার্য্য হইতেছে।

হিমালয়বাবু বলিলেন "বটে তুমি এ সকল খবর কোথায় পেলে আমাকে সমুদয় বৃত্তান্ত বিস্তার করিয়া বল?"

পশু। আজ্ঞে ঐ wireless telegraphic instrument ধরিয়াই সকল জানিতে পারিলাম। আমি ঠাকুরদার বাটীর নিকট দিয়া আপনার এখানে আসিতেছি, এমন সময়ে দেখি হরিদাসী নামে আপনাদের সেই চাকুরাণীটা ঠাকুরদার বাটী হইতে বাহির হইতেছে। আমি তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কি হরিদাসী কেমন আছ, আজ কাল কোথায় কাজ করিতেছ।" তাহাতে সে বলিল যে সে ওপারের যোগেশ বাবুদের বাটীতে কাজ করিতেছে। যোগেশবাবু দশটা টাকা বামুন দিদিকে দেবার জন্য আমায় দিয়াছিলেন। হরিদাসীর এই কথায় আমি তাহাকে ধরিয়া বসিলাম। বলিলাম "টাকা কাহাকে দিতে বলিয়াছেন এবং যোগেশবাবু কেনই বা টাকা দেন।" বেটি বলিল "মহাশয় আপনি কি রকম ভদ্রলোক —পরের কথায় আপনার অত মাথাব্যাথা কেন?" তারপর আপনিই বলিল "সৌদামিনী দিদিকে দিতে বলেছেন। বোধ হয় যোগেশবাবু ধারিতেন! এখন বলুন দেখি মশাই যোগেশবাবু

অত বড় লোক বিধবা ঠান্‌দিদির নিকট টাকা ধারেন, এ সকল কথার মানে কি ? ইহার নাম বা কি ?

পশুপতি নিস্তব্ধ হইলে হিমালয়বাবুর এক বন্ধু বলিলেন "পশুবাবু ! আপনি ইহার নাম কি বুঝিতে পারিলেন না। ইহার নাম দয়া। যোগেশবাবু অতিশয় দয়ালু ব্যক্তি, বোধ হয় ঠাকুরদার মৃত্যুর পর ইহাদের দুরবস্থার কথা শুনিয়া থাকিবেন, সেই জন্য বিধবাদ্বয়ের সাহায্যার্থ কিছু মাসহারা দিয়া থাকেন।"

পশুপতি এই বাবুটীর কথায় সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না, বলিলেন "হাঁ যোগেশবাবু দয়ালু ব্যক্তি বটে ; কিন্তু তাঁহার দয়ার পাত্রীগুলিও বেশ বাছাই বাছাই।"

হিমালয়বাবুর দেহে লালপানির ক্রিয়া বেশ আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি সট্‌কায় মুখ দিয়া গম্ভীর ভাবে সমুদয় শুনিতেছিলেন। এক্ষণে হঠাৎ উপাধানের উপর এক বজ্র-মুষ্টি পরিত্যাগ করতঃ বিকট চীৎকার করিয়া বলিলেন "তাহা কখনই হইবে না। উহা হইল আমার হক্ সীমানার জমী। আমি থাকিতে ওপার হইতে যোগেশ আসিয়া যে জমী দখল করিবে, তাহা কখনই হইবে না। ও জমী আমার চাই—অনেক দিনের টাঁক।"

হিমালয়বাবুর অনুচরবর্গের মধ্যে এক ব্যক্তি নেশার চুর হইয়া ভূমিতলে গড়াগড়ি যাইতেছিলেন। তিনি এক্ষণে চীৎকার করিয়া জড়িত স্বরে বলিয়া উঠিলেন "আজ্ঞে একথা আপন্দি দুশো-বার ব'লতে পারেন। হক্‌সীমানার জমী কোন জমিদার কখনই ছাড়েন না। দুনো মূল্য দিয়াও ঐ জমী আপনার রাখা উচিত।"

হিমা। তা'হলে এখন উপায়?

পশু। আজ্ঞে উপায় ঐ wireless শ্রীমতী হরিদাসী সুন্দরী।

হিমা। উত্তম কথা, তবে তাকে খবর দাও।

এ দিকে হিমালয় বাবু যখন উপাধানের উপর বজ্রমুষ্টি পরিত্যাগ করেন, সেই সময়ে তাঁহার হাতের ঝট্‌কানি লাগিয়া কলিকা হইতে একখানি গুলের আগুন ছট্‌কাইয়া সতরঞ্চির উপর পড়িয়া, উহা ধিকি ধিকি পুড়িতেছিল। এক্ষণে হঠাৎ সেই আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সর্ব্ব প্রথমেই একখানি কাষ্ঠের ফ্রেমে আঁটা ছবিতে সেই আগুন লাগিল। ছবিখানি দেখিতে দেখিতে জ্বলিয়া উঠিল। এতক্ষণে সকলের চেতনা হইল। মাতালগণ তখন "জল নিয়ে আয়, জল নিয়ে আয় শব্দে" গগন ভেদ করিতে লাগিল। মাতালবাবুরা টলিতে টলিতে জল আনিতে চলিল। ইত্যবসরে আগুনের উত্তাপ কড়িকাঠে লাগিতেছিল। কিন্তু ভজা বেয়ারার উদ্যমে ও ক্ষিপ্রকারিতায় অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। সে যাত্রায় হিমালয় বাবু রক্ষা পাইলেন।





অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।



শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র তাঁহার ধ্যানে গড়া প্রেয়সী শ্রীমতী ষোড়শীবালা দেবীর প্রেমে হতাশ হইয়া জ্বরবিকার, পরে রক্ত-আমাশয় প্রভৃতি নানা রোগে অনেকদিন কষ্ট পাইলেন। তাঁহার অসুস্থাবস্থায় হরেন্দ্র তাঁহার কাগজখানি কোন প্রকারে চালাইয়া আসিতেছিলেন। সুরেশবাবু এক্ষণে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মন বড় খারাপ। তাঁহার আর সেরূপ উৎসাহ নাই। পত্রিকাখানির উন্নতির জন্য আর তেমন যত্ন নাই। সর্ব্বদাই তাঁহাকে বিমর্ষ ও অন্যমনস্ক দেখা যায়। হরেন্দ্র আসিয়া মধ্যে মধ্যে দিব্য বক্তৃতা দ্বারা তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা পান, কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিরক্তি বোধ হয়। আজ অপরাহ্লে হরেন্দ্র আসিয়া বলিলেন "সুরেশবাবু! তুমি ভাই দিনে দিনে যেন শুকাইয়া যাইতেছ, ঐরূপ ভাবে থাকিলে তোমার শরীর শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যাইবে।"

সুরেশবাবু একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"হরেন্দ্রবাবু! আমার সব গিয়াছে, শরীর লইয়া আর কি করিব। আমার মন, প্রাণ, উৎসাহ,—সর্ব্বস্ব ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নশ্বর শরীর লইয়া আর কি হইবে।"

চন্দ্র

হরে। আপনার কিছুই যায় নাই। আপনি ওরূপ বিমর্ষ হইয়া থাকিবেন না। Eat, drink, and be merry স্ফুর্ত্তি করুন, চলুন আজ থিয়েটার দেখে আসি।

সুরে। না হরেন্দ্রবাবু! আমার ও সকল ভাল লাগে না।

হরে। আচ্ছা আপনি আমার কথা রেখে আজ চলুন না। আজ "বিষবৃক্ষ" অভিনয় হইবে। একজন নূতন অভিনেত্রী কুন্দনন্দিনীর পাট অভিনয় করিবে। শুনেছি সে না কি খুব স্বাভাবিক অভিনয় করে।

সুরেশচন্দ্র যাইবেন না, হরেন্দ্রও ছড়িবেন না। অনেক বাদানুবাদের পর সুরেশচন্দ্রের পরাজয় হইল। তিনি থিয়েটারে যাইতে সম্মত হইলেন।

সন্ধ্যার পর দুই বন্ধুতে বেশভূষা করিয়া পথে বাহির হইলেন। হরেন্দ্র আপন মণিব্যাগ হইতে টাকা বাহির করিয়া দুইখানি ষ্টলের টিকিট ক্রয় করিয়া আনিলেন এবং বন্ধুর হাত ধরিয়া রঙ্গালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অভিনয় আরম্ভ হইতে তখনও একঘণ্টা বিলম্ব ছিল। তথাপি তাঁহারা দেখিলেন রঙ্গালয়ের মধ্যে সকল স্থান পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, গ্যালারিতে আর একটী লোকেরও বসিবার স্থান নাই। স্থানাভাবে অনেকে গ্যালারির জানালায় বাদুড় পক্ষীর ন্যায় ঝুলিতেছেন। পিটেও ঐ প্রকার জনতা দেখা যায়। ষ্টলে এখনও দুই চারিখানি আসন খালি ছিল। উপরে বক্সেও কেবল মনুষ্য মূর্ত্তি দেখা যায়। উহার মধ্যে যাঁহারা অধিক বাহাদুর, তাঁহারা তাঁহাদের হীরামনকে সঙ্গে লইয়া বসিয়া, বেহদ্দ বাহাদুরী উপভোগ

করিতেছিলেন। সর্ব্বোপরি স্ত্রীলোকদিগের বসিবার স্থান, সেখানে জনতা ও কল কল নাদ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মা লক্ষ্মীরা গরমে পচিয়া যাইতেছেন, অল্পাধিক সকলেরই জালিবোট আছে, সে গুলি নানারকম ধ্বনিতে রঙ্গালয়ের রঙ্গ বাড়াইয়া তুলিতেছে। চারিদিকে গোলযোগ। সুরেশবাবু অত্যন্ত বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিয়া, হরেন্দ্রকে বাহিরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। এমন সময় ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া কন্‌সার্টপার্টিকে বাজাইতে সঙ্কেত করা হইল। কিন্তু কনসার্ট বাজিল না; কন্‌সার্টের সভ্যগণ, সকলে আসিয়া জমিতে পারেন নাই। কেহ তখন পার্শ্বস্থিত খাবারের দোকানে তামাক টানিতেছিলেন—ঘণ্টা শুনিয়া শেষ টান দিয়া হুঁকা ছাড়িতেছিলেন। কেহবা চাটের দোকানে বসিয়া কাঁকড়া সুন্দরীর বৃহৎ দাড়া ভাঙ্গিতেছিলেন। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা মধ্যে মধ্যে আপন আপন যন্ত্র হইতে একটু একটু আওয়াজ বাহির করিয়া দর্শকমণ্ডলীর উৎসাহবর্দ্ধন করিতেছিলেন। এদিকে গ্যালারির সভ্যগণ কন্‌সার্ট বাজাইতে বিলম্ব দেখিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা অট্ট হাস্য, বিকট হাস্য এবং নানাপ্রকার ধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং সেই সঙ্গে থিয়েটারের ম্যানেজার মহাশয়ের নানারূপ সুখাদ্যের ব্যবস্থাও করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে হঠাৎ যদি কেহ বাহির হইতে রঙ্গালয় প্রবেশ করেন, তবে তিনি হয়ত রঙ্গালয়কে গব্যয়-হাউস বলিয়া ভ্রমে পড়িতে পারেন।

থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণের এই বিষয়ে বিশেষ ধৈর্য্য দেখা

যায়। তাঁহারা গ্যালারির সভ্যগণকে কিছু বলেন না। কারণ তাঁহারা জানেন, যে ইহারাই তাঁহাদের লক্ষ্মী। ইহার ভিতর পাস নাই, সুপারিস নাই। নগদ পয়সা দিয়া সকলেই টিকিট ক্রয় করিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের একটু উৎপাত সহ্য না করিলে চলিবে কেন।

যথাসময়ে অভিনয় আরম্ভ হইল। হরিদাসী বৈষ্ণবীর গান শুনিয়া সুরেশচন্দ্র হরেন্দ্রের নিকট অনেক প্রশংসা করিলেন। বলিলেন "গানের ভাবটী বড় সুন্দর।"

হরে। আপনি বিষবৃক্ষ পড়িয়াছেন তো?

সুরে। না।

হরে। অ্যাঁ বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষ পড়েন নাই, বলেন কি!

সুরে। আমি বঙ্কিমবাবুর কোন বহি পড়ি নাই।

হরে। আপনি আশ্চর্য্য ক'ল্লেন! বাঙ্গালীর ছেলে বঙ্কিম বাবুর বহি পড়েন নাই। মাইকেলের মেঘনাদ-বধ-কাব্য পড়েন নাই। তবে এতদিন কি করিলেন! একথা কিন্তু আর কাহার কাছে বলিবেন না।

সুরে। ও সকল ছাই ভস্ম আর কি পড়িব। যাক্ এখন ও কথায় প্রয়োজন নাই। কেমন অভিনয় হইতেছে দেখুন।

সুরেশ বাবু অভিনয় দর্শন করিতে করিতে ক্রমে তন্ময়চিত্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। কুন্দনন্দিনীর বিধবা বেশ, সেই কিন্তু কিন্তু ভাবে, তাঁহার হৃদয়ে করুণ রসের সঞ্চার হইতেছিল। দৃশ্যের পর যত নূতন দৃশ্য অভিনয় হইতে লাগিল, সুরেশচন্দ্র ততই যেন কুন্দনন্দিনীর পক্ষপাতী হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন—"নগেন্দ্রের ইহার প্রতিকার করা

উচিত।" এইরূপে ক্রমে সুরেশচন্দ্রের হৃদয় মধ্যে নানারূপ তর্কের ঝড় বহিতে লাগিল। তিনি বলিলেন—"নগেন্দ্র ইহার প্রতিকার করিতে পারেন বটে। কিন্তু সূর্য্যমুখী তাহা হইলে কি মনে করিবে?"

কিয়ৎকাল পরে সুরেশচন্দ্র আবার বলিলেন—"সূর্য্যমুখী কি মনে করিবে বলিয়া, কুন্দনন্দিনীর ন্যায় অসহায়া অবলার প্রাণে ব্যথা দেওয়া নগেন্দ্রের ভাল কার্য্য হইতেছে না।" দৃশ্যের পর যত নূতন দৃশ্য অভিনয় হইতে লাগিল, সুরেশচন্দ্রের মানসিক অবস্থা ততই খারাপ হইয়া পড়িতে লাগিল। মধ্যে ড্রপ পড়িলে, তিনি হরেন্দ্রকে এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। হরেন্দ্র তাঁহার মতে মত জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "ঠিক কথা।"

এইবারের দৃশ্যে কুন্দনন্দিনী সূর্য্যমুখী কর্ত্তৃক অকারণে তিরস্কৃত হইয়া নগেন্দ্রের বাটী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। যাইবার সময়ে কুন্দনন্দিনী বাগান হইতে এক একবার নগেন্দ্রের শয়ন কক্ষের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছিলেন। নগেন্দ্রের শয়নকক্ষ হইতে শার্শী ভেদ করিয়া আলোক রশ্মি বাগানে পড়িয়াছে। কুন্দনন্দিনী সেই আলোক দৃষ্টে বলিতেছেন "নগেন্দ্র! জন্মের মতন বিদায়, আর দেখা হইবে না, অভাগিনীর কোথাও স্থান নাই, অনাথিনীর মরণই মঙ্গল।"

এই দৃশ্যে সুরেশচন্দ্রকে ধৈর্য্যচ্যুত করিল। হঠাৎ তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় দণ্ডায়মান হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন "ভয় নাই, কুন্দনন্দিনী ভয় নাই। আমি তোমায় আশ্রয় দিব। নগেন্দ্র ধিক্ তোমায়; শত ধিক, তুমি কাপুরুষ, সূর্য্যমুখী

কি মনে করিবে বলিয়া, কুন্দনন্দিনীর দুঃখের প্রতিকার না করা নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য।"

অকস্মাৎ এই ব্যাপারে রঙ্গালয়ে একটা ভয়ানক গণ্ড-গোল পড়িয়া গেল। এমন কি কিয়ৎকালের জন্য অভিনয় বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। হরেন্দ্রের হাঁসিতে হঁসিতে পেট ফুলিয়া উঠিয়াছে, তিনি এক্ষণে আসন ত্যাগ করিয়া মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছিলেন। গ্যালারীর সভ্যগণ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন "মাতাল মাতাল, বাহির করিয়া দাও।" থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষেরা আসিয়া সুরেশবাবুকে "অর্দ্ধচন্দ্র শশীভূষণের" ব্যবস্থা করিতেছিলেন। কিন্তু এই সময়ে হরেন্দ্র তাঁহাদের মাঝে আসিয়া বলিলেন "মহাশয় আপনারা যাহা মনে করিতেছেন, তাহা নয়। উনি মাতাল বা পাগল নহেন। উনি একজন লেখক ও ভাবুক লোক। কুন্দনন্দিনীর পার্ট খুব স্বাভাবিক হইতেছিল। ভাবে তন্ময়চিত্ত হইয়া ঐ রূপ করিয়াছেন মাত্র।" এই কথা শুনিয়া তখন ম্যানেজার মহাশয় সুরেশবাবুকে বিশেষ খাতির করিয়া ষ্টেজের ভিতরে লইয়া গেলেন। অভিনয় পুনরায় আরম্ভ হইল। ম্যানেজার মহাশয় সুরেশবাবুকে বলিলেন,—"মহাশয় আজ আমরা ধন্য হইলাম। আপনার ন্যায় হৃদয়গ্রাহী, ভাবগ্রাহী ব্যক্তিদিগের শুভাগমন প্রার্থনীয়—তাহাতে আমাদেরও অভিনয় করিতে উৎসাহ হয়।" তারপর ম্যানেজার মহাশয় যে কত ক্লেশ সহিয়া এই অভিনেত্রী-টীকে তৈয়ারী করিয়াছিলেন, সে সমুদয় সুরেশবাবুকে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন। সুরেশচন্দ্র গম্ভীর ভাবে দুই একটা হুঁ, হাঁ দিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাহিরে আসিলেন।

থিয়েটার ভাঙ্গিয়া গেলে পথে যাইতে যাইতে হরেন্দ্র বলিলেন—"সুরেশ ভায়া! আজ কি কেলেঙ্কারিটাই করিলে।" সুরেশচন্দ্র তখনও কুন্দনন্দিনীর ভাবে বিভোর ছিলেন, বলিলেন "কেলেঙ্কারির এখন হয়েচে কি। আমি কুন্দনন্দিনীকে নিশ্চয় আশ্রয় দিব। তা না হ'লে আমি কখনই বাঁচিব না।" হরেন্দ্র বলিলেন "সে জন্য আর চিন্তা কি, আমি কালকেই তোমার সহিত উহার পরিচয় করিয়া দিব।" পথে দুই বন্ধুতে আর কোন কথা হইল না। হরেন্দ্র আপন বাটী চলিয়া গেলেন, সুরেশচন্দ্রও কার্য্যালয়ে আসিয়া শয়ন করিলেন।





ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

চাঁদনী রাত্রি। চাঁদের কিরণ মাখিয়া জগৎসংসার হাসিতেছিল। সৌদামিনী ছাদে বসিয়া চরকায় সূতা প্রস্তুত করিতেছিলেন। তজ্জনিত পরিশ্রমে তাহার অঙ্গের স্বেদ বারিবিন্দু সকল সন্ধ্যা সমীরণ সযতনে মুছাইয়া দিতেছিল। ক্ষণকালের জন্য চরকা রাখিয়া সৌদামিনী চাঁদের পানে তাকাইলেন—চাঁদ হাসিতে হাসিতে ভাসিতে ভাসিতে কোন দূর জগতে চলিয়াছে। চাঁদের কিরণ মাখিয়া জগৎ হাসিতেছে—কি মধুর ভাব, কি সুন্দর দৃশ্য। সৌদামিনী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "এ সৌন্দর্য্য সুধা আমাদিগের ন্যায় হতভাগিনীদিগের পান করিতে নাই। আমাদের ন্যায় অভাগিনীদের পক্ষে সুধাও গরল উৎপাদন করে।"

সৌদামিনী চাঁদের সৌন্দর্য্য দেখিবেন না বলিয়া, পুনরায় চরকায় মন দিলেন। এই সময়ে হরিদাসী ঝি আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—'হরিদাসি!

এমন সময়ে হঠাৎ কি মনে করে। হরিদাসী কোন উত্তর না করিয়া সৌদামিনীর নিকটে আসিয়া বসিল। চরকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সৌদামিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কি খবর হরিদাসী।" এই বারে হরিদাসী একটু মুচকি হাসিয়া বলিল "বামন দিদি! একটা সংবাদ লইয়া আসিয়াছি, ভয়ে বলিব কি নির্ভয়ে বলিব।" সৌদামিনী তাহাকে নির্ভয়ে বলিতে অনুমতি দিলেন। হরিদাসী তখন সৌদামিনীর কানে কানে কি বলিতে লাগিল। হরিদাসীর কথা সমাপ্ত হইলে সৌদামিনী একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"হরিদাসী তুই উত্তম সংবাদ আনিয়াছিস্। তবে দুঃখের বিষয় এই যে তোর সংবাদের জন্য আমি তোকে পুরস্কৃত করিতে পারিলাম না। আমি যদি আজ বাদসাহের বেগম হইতাম তবে তোর এই সংবাদের জন্য কণ্ঠ হইতে মতির মালা খুলিয়া দিতাম। কিন্তু আমি অনাথিনী, বিধবা, হাতে এক গাছি লোহা পর্য্যন্ত নাই যে তোকে বিদায় করি।" হরিদাসী বলিল, "সেজন্য বামনদিদি তুমি দুঃখ করিও না। আমি দশ টাকা আগাম হাতে লইয়া তবে তোমায় সংবাদ দিতে আসিয়াছি। আবার তোমার নিকট হইতে জবাব লইয়া যাইব তাহার জন্যও দশ টাকা আগে নেব, তবে "হুঁ।" করিব।"

সৌদা। তা'হলে তুই বেশ একটা পয়সা উপার্জ্জনের রাস্তা পাইয়াছিস্ বল? কিন্তু হরিদাসী বিধাতা কি যত বুড়ো মড়া, আমার অদৃষ্টে লিখিয়াছিলেন।

হরি। না বামন দিদি তুমি যা মনে ভাবচ তা নয়। এমন বুড়ো আর কি? হিমালয়বাবুর বয়স আর কত হইবে।

খুব সৌখীন লোক, বেশ সুখে থাক্‌বে। ত'াহলে আমি এখন তাঁহাকে কি বলিব তাই বল।

সৌদা। বলিবে যে তাঁহার প্রস্তাব ভদ্রোচিতই হইয়াছে। তাঁহার স্থায় মহাশয় ব্যক্তি গরীবের দুঃখ না ঘুচাইলে, কে আর ঘুচাইবে। তবে পুরুষ ভ্রমর জাতীয় সে কারণে ভয় হয়। আমার প্রতি তাঁহার এ করুণা স্থায়ী কি না, সেটা দেখা একান্ত আবশ্যক।

হরি। এ কথা জজসাহেবে মানিয়া থাকেন। তা তুমি এ কথা দুই শত বার বলিতে পার। তাহ'লে তুমি কি ক'র্‌তে চাও।

সৌ। আমি তাঁহার ভালবাসার গভীরতার কিছু পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করি। তিনি রাজী হবেন কি ?

হরি। তা না হ'লে চলিবে কেন? অবশ্য রাজী হইবেন।

সৌদা। তবে তাঁহাকে বলিও যদি তিনি যথার্থই এ অধিনীকে কৃপা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার অনুরোধে তাঁহাকে এক বৎসরের জন্য বাক্যালাপ বন্ধ করিতে হইবে। এই এক বৎসরের মধ্যে তিনি স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব কাহারও সহিত একটীও কথা কহিতে পারিবেন না।

হরি। ও বাবা এ যে তোমার বিদ্‌কুটে পরীক্ষা। সোণা চাও, দানা চাও, সহজ কথা আমরা যা বুঝি।

সৌ। সোণা দানা যাহার আছে সে অনায়াসে দিতে পারে। তাহাতে কি ভালবাসার পরীক্ষা হয়।

হরি। তা'হলে তুমি এক রকম বলিতেছ, যে তিনি তোমার প্রেমে এক বৎসরের জন্য বোবা হইয়া থাকিবেন।

সৌদা। হাঁ তা বোবাই বল, আর হাবাই বল, এক বৎসরের জন্য কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিবেন না।

হরি। ভাল বলিগে—কিন্তু বাপু তোমার এ সৃষ্টি ছাড়া পণ শুনিয়া, সকলেই লাঙ্গুল গুটাইবে।

হরিদাসী প্রস্থান করিলে সৌদামিনী ছাদ হইতে অবতরণ করিলেন এবং বড়রাণীকে সমুদয় কথা বলিলেন। বড়রাণী শুনিয়া হিমালয়কে অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং গিরিবরের ঊর্দ্ধতন সাত পুরুষ এবং নিম্নতন তিন পুরুষকে নিমন্ত্রণ করিয়া উপাদেয় খাদ্যসমূহের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন এবং তদবধি তাঁহারা হিমালয়চন্দ্রের বাটীতে যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিলেন। সৌদামিনী বলিলেন "দিদি তুমি গোলমাল করিও না, চুপ করিয়া থাক। গরীবের ভগবান্ আছেন। তিনি উহার পাপের সাজা দিবেন।"

এদিকে হিমালয়বাবু হরিদাসীর আশাপথ চাহিয়া বসিয়াছিলেন। এক্ষণে হরিদাসী তাঁহার সন্নিধানে আসিবা মাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "হরিদাসী, কি সন্দেস আনিলে।"

হরিদাসী বলিল "তা সন্দেস ভালই আনিয়াছি—আবার খাব।" তাহার পর হরিদাসী সৌদামিনীর রূপ গুণ বর্ণনা করিতে বসিল। "আহা কি রূপই দেখে এলাম! যেন ফুটন্ত পদ্ম ফুলটী। বিধবা হ'য়ে ছুঁড়ির রূপ যেন আরও বেড়েছে।"

হিমা। আসল কথা কি ব'ল্লে। রাজী কি না?

হরি। রাজী না তো আর কি। বিশেষ আমি যখন কাজে হাত দিয়াছি, তখন আর যায় কোথায়! তবে একটা কথা বলেচে—সে আপনার ভালবাসার কিছু পরীক্ষা লইতে চায়।

হিমালয় বাবু আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিলেন,—"সে আর বেশি কথা কি! এক্ষণে সে আমার জীবনের ধ্রুবতারা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাও হরিদাসী তাকে জিজ্ঞাসা করে এসো কি পরীক্ষা সে ধনী চায়। তাহার একটী মাত্র মুখের কথায় আমি সহাস্য বদনে গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিতে পারি।"

হরি। ততদুর করিতে হইবে না। সে সেরূপ কঠিন নয়। সে বলিয়াছে যদি আপনি তাহাকে যথার্থ ভাল বাসেন, তবে তাহার অনুরোধে আপনাকে এক বৎসরকাল বোবা হইয়া থাকিতে হইবে। এক বৎসর কাল কাহারও সহিত একটীও কথা কহিতে পাইবেন না। তা এ সামান্য একটু ক্লেশ সহ্য না করিলে, কহিনুর রত্ন কি আর অমনি লাভ হয়?

পরীক্ষার কথা শুনিয়া হিমালয়বাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন—"সামান্য কথা কি বলিতেছ হরিদাসী। লোকালয়ে থাকিয়া মানুষে কি ইহা পারে। না তাও কখন সম্ভব।"

হরি। তবে আর আমি কি করিব বলুন। এই মরিতে পারিতেছিলেন, আর কিছুদিন বোবা হইয়া থাকিতে পারিবেন না। মানুষের মরাটা কথার কথা।

হিমা। হরিদাসী তুমি বুঝিতে পারিতেছ না।

হরি। না বাবু আমি ওসকল বুঝিতে পারি না। আপনি আমার সন্দেশের টাকা দিন, আমি এখন আসি।

হরিদাসী চলিয়া যায় দেখিয়া হিমালয়বাবু পুনরায় তাহাকে বলিলেন,—"যে তুমি আর একবার যাও তাহাকে বুঝাইয়া বল

যে, সে ধন দৌলত যাহা চায়, তাহাই দিব। ওরূপ বিদ্‌কুটে বায়না ছাড়িয়া দিতে বলগে।"

হরি। সে সকল কথা আমি অনেক বলিয়াছি, সে কোন কথাই শুনিবে না।

হিমা। তা'হলে কি উপায় হরিদাসী।

"কি উপায় ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখুন। না পারেন তো কি আর হবে। আমার কেবল মুখ নষ্ট হইল।" এই বলিয়া হরিদাসী চকিতে তথা হইতে প্রস্থান করিল।





বিংশ পরিচ্ছেদ।



কলিকাতা রামবাগানে এক দ্বিতল অট্টালিকার সুসজ্জিত একটী কক্ষ মধ্যে এক যুবক কোন বৃদ্ধার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। বৃদ্ধা বলিতেছে—"বাবা একটু বুঝে দেখ, আমার মেয়ে সাধারণ রকমের নয়। উহার গুণ অনেক, আর রূপ তো স্বচক্ষেই দেখিয়াছ। গাহিতে পারে, নাচিতে পারে, আবার হারমণি বাজাতে পারে। ভদ্রলোকের খাতির যত্ন যে রকম জানে, তাহা মুখে বলিয়া আর কি হইবে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এখানে তোমার আসা যাওয়া থাকিলে জানিতে পারিবে।"

যুবক বলিলেন—"আপনার মেয়ের রূপ গুণ যে অসাধারণ, তাহা আমি অস্বীকার করি না। তা'হলেও এক্ষণে আমি মাসিক দুইশত টাকার অধিক দিতে প্রস্তুত নহি।"

বৃদ্ধা পুনরায় বলিল—"দেখ বরাবর উহার ভাল সামগ্রী সকল খাওয়া অভ্যাস। ছানা, মাখন, ক্ষীর, সর, ননী প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী সকল, প্রত্যহ উহার জন্য ঘরে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। উহার যখন যেটা ইচ্ছা হয়, তাহাই খায়। এই সকল কারণে খরচও অনেক লাগে। তাই

বলিতেছিলাম বাবা! আর কিছু না বাড়িলে চলিবে না—তোমা-দেরই কষ্ট হবে। আমার আর কি, টাকা কি আমি হাতে করে নেব। তোমরাই খরচ পত্তর ক'র্‌বে। আবার তুমি ব'লচ, যে থিয়েটারে আর যেতে পাবে না। তা'হলে কি করে চল্‌বে বাছা।"

"আপনার কন্যাকে একবার পাঠাইয়া দিন, দেখি তাহার কি অভিপ্রায়। তবে উপস্থিত আমি দুইশত টাকার অধিক দিতে পারিব না।"

"সেই কথাই ভাল। তোমরা দুইজনে পরামর্শ করিয়া যাহাতে ভাল হয় তাহাই কর। দুইশত টাকায় যদি ও সঙ্কুলান করিতে পারে, তবে আমার কোন আপত্তি নাই।" এই বলিয়া বৃদ্ধা তথা হইতে প্রস্থান করিয়া কন্যার নিকটে গেল এবং মোচড় দিয়া মাসিক তিন শত টাকা আদায় করিবার জন্য তাহাকে নানারূপ উপদেশ প্রদান করিল।

বৃদ্ধার প্রস্থানের অনতিবিলম্বে ঝুমুর ঝুমুর ঘুঙুর বাজাইয়া এক যুবতী সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। যুবতীর নয়নে সুর্‌মা রেখা, অধরে তাম্বুলরাগ, সাজসজ্জা পরিপাটী। হাবভাব মারাত্মক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যুবতী যুবকের নিকটস্থ হইয়া ঈষৎ সহাস্য বদনে বক্রদৃষ্টি সহযোগে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি আমায় স্মরণ করিয়াছেন?"

যুবক বলিলেন—"আমার সৎ ইচ্ছার কথা, বোধ হয়, তোমার মাতার নিকট শুনিয়া থাকিবে। কিন্তু টাকা লইয়া গোলযোগ হইতেছে। আমি বলিয়াছি দুই শত টাকার অধিক এক্ষণে আমি দিতে পারিব না। এখন তোমার হাত—তুমি মারিলেও মারিতে পার, রাখিতেও মানা নাই।"

সুন্দরী বলিল—"দেখুন টাকা কড়ি ও সকল হইল হাতের ময়লা। কত আসিতেছে কত যাইতেছে। আসল কথা মনের মিল হওয়া দরকার। ব্যবহার ভদ্র হওয়া চাই। তবে সংসারে থাকৃতে হ'লেই টাকার খরচ আছে, সেই জন্যই টাকা কড়ির কথা তোলা।"

এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে যুবক মনে মনে কামিনীর অনেক প্রশংসা করতঃ বলিলেন—"তোমার সহিত আমার মনের মিল নিশ্চয় হইবে, ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি, কারণ তোমার অন্তঃকরণ অতি মহৎ।"

যুবতী। বেশ দুই শত টাকা দিলে যদি আপনি সন্তুষ্ট হয়েন, তবে তাহাই দিবেন। তাহাতে কি আর আসে যায়। তবে একটা কথা আছে—

যুবক। কি কথা অনুমতি হউক।

যুবতী। আমার চিরকাল গহনার উপর কিছু ঝোঁক বেশী। ভাল গহনা, কি ভাল পোষাক পছন্দ হইলেই যত টাকা লাগুগ না কেন, আমি তাহা ক্রয় করি।

যুবক। সে জন্য কোন চিন্তা নাই। আমি তোমায় ভাল ভাল গহনা, জামা, কাপড় সাহেব বাড়ী থেকে কিনিয়া দিব। ভাল কথা, তোমার নামটী কি এখনও জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

যুবতী। এ অধিনীকে লোকে টগর বলিয়া ডাকে।

বলা বাহুল্য এই যুবক আমাদের সুরেশচন্দ্র এবং যুবতী সেই থিয়েটারের কুন্দনন্দিনী। হরেন্দ্র একদিন সুরেশকে লইয়া আসিয়া কুন্দের আবাস দেখাইয়া দিয়াছিলেন।

কবিবর সুরেশচন্দ্রের কাণে টগর নামটা যেন একটু চড়া লাগিল। তিনি বলিলেন—"হাঁ টগর নামটা মন্দ নয়, তবে শব্দটা যেন কড়া লাগে। আমি তোমায় কুন্দ বলিয়া ডাকিব।"

"আপনার যাহা ইচ্ছা—তাহাই বলিয়া ডাকিবেন, তাহাতে আর কি হইয়াছে" এই বলিয়া হাবভাবময়ী টগর সুরেশের প্রতি একটী নয়নবাণ ত্যাগ করিল। নয়নবাণে জর জর হইয়া সুরেশ বলিলেন—"কাছে এসো না, অতদূর থেকে কি আলাপ হয়?"

টগর সুরেশের নিকটে সরিয়া আসিয়া বসিল। সুরেশ টগরের হাত দুখানি আপন হাতের উপরে লইয়া বলিলেন—"টগর তুমি কি সুন্দর! কিন্তু দেখ আমি থিয়েটারে তোমায় কুন্দনন্দিনীর বেশে যাহা দেখিয়াছিলাম, উহা বড় মনোরম।"

টগর বলিল "তা'হলে আমি আপনার মনস্তুষ্টির জন্য মাঝে মাঝে সেই বেশ পরিধান করিব।" টগরের মিষ্ট কথায়, নম্রভাবে এবং হাভভাবের অব্যর্থ সন্ধানে আত্মহারা হইয়া সুরেশচন্দ্র হঠাৎ "কুন্দ! প্রাণের কুন্দ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

"আচ্ছা থিয়েটারে সে দিন আপনিই কি ঐরূপ চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন। বাবা আমি যা ভয় পেয়েছিলাম।" এই বলিয়া টগর সুরেশের আরও একটু গা ঘেষিয়া বসিল।

সুরেশ বলিলেন—"কি জান আমরা হ'লাম লেখক কিনা, যাহাকে কবি বলে, বুঝিতে পারিয়াছ? তোমার পার্ট সে দিন খুব ভাল অভিনয় হইতেছিল। আমি খুব মনোযোগ করিয়া দেখিতেছিলাম। অপরাপর লোকদিগের ন্যায় আমরা তো আর গোলযোগ করিতে থিয়েটারে যাই না।

টগর। এখন বুঝিতে পারিয়াছি। আপনার ভাব লাগিয়া গিয়াছিল। যেমন হরিনাম শুনিলে বৈষ্ণবদিগের হয়।

সুরেশ। হ্যাঁ, ঠিক সে রকম নয়, তবে অনেকটা তাই বটে।

"আপনার নামটী কি এখনও বলেন নাই।"

"আমার নাম শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আমি কিন্তু তোমায় কুন্দ বলিয়া ডাকিব।"

"তাহ'লে আমি কি আপনাকে নগেন্দ্র বলিয়া ডাকিব ?"

"বেশ তুমি খুব অমায়িক বটে। কিন্তু কুন্দ মনে মনে নগেন্দ্রকে যেরূপ ভাল বাসিয়াছিল, তুমি আমাকে সেরূপ ভাল বাসিবে তো ?" আমি বড় ভালবাসার কাঙ্গাল।

"আপনার কি একটী সূর্য্যমুখী আছে ?"

"না আমার ত্রিসংসারে কেহ নাই। আজ হইতে তুমিই আমার সর্ব্বস্ব হইলে।"

"আমিও ভালবাসার পাত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। মনের মতন মানুষ না পাইয়া, অবশেষে একটা বিড়ালকে ভালবাসিয়াছিলাম। কিন্তু অভাগিনীর কপাল দোষে আমার সে ভালবাসার নিধিটী আমায় জন্মের মতন ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে।"

"অ্যাঁ, ছি ছি, তুমি বিড়ালকে ভালবাস। এই দোষটা তোমাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। ছি ছি, অনার্য্য বিদেশী বিড়ালকে ভালবাসা আর্য্যানারীদের উচিত হয় না।"

"ওমা সে আবার কি ?"

"ব'লছি শোনো—আমাদের সংস্কৃত প্রাচীনতম সাহিত্যে

অনেক জন্তুর নাম উল্লেখ আছে, বিড়ালের নাকি নাম নাই। প্রাচীন আর্য্যজাতীর বিভিন্ন শাখা যে সকল দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সকল দেশে বিড়াল ছিল না। তারপর বহুদিন পরে কোন সময়ে আলুর মত কোন অনার্য্য বিদেশ ভূমি থেকে বিড়াল এসে আর্য্যদেশ মধ্যে, আর্য্যগৃহ মধ্যে ও আর্য্যসাহিত্য মধ্যে চিরস্থায়ী স্থান লাভ করিয়াছে। এই বিদেশী বিড়াল জাতীর স্বর্গাদপি গরীয়সী আদি মাতৃভূমি মিশরদেশ। জীবতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, প্রাচীন মিশর দেশে ব্যাঘ্রজাতীয় কোন আরণ্য জন্তু গ্রাম্যতাপাদিত হ'য়ে বিড়ালরূপ ধারণ করেছেন।"

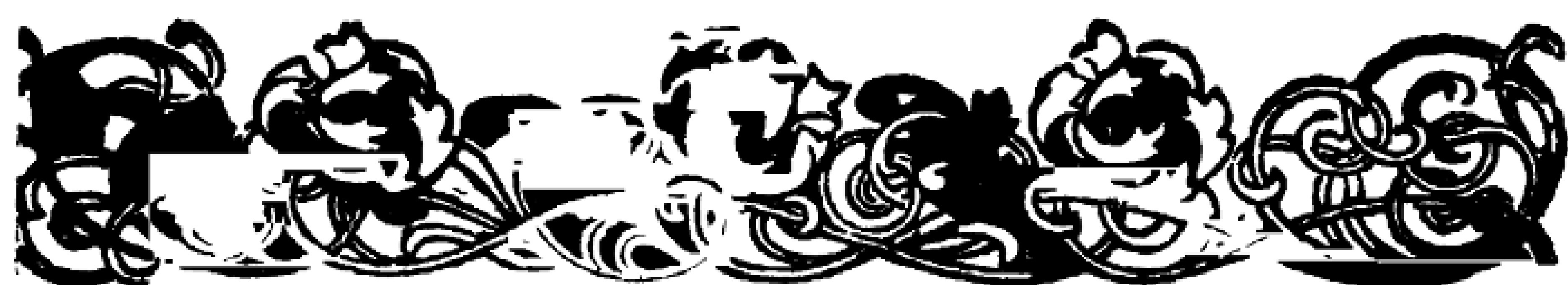
সুরেশচন্দ্রের বক্তৃতা আর থামে না দেখিয়া টগর পান আনিবার ছুতা করিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল এবং কিয়ৎ-কাল পরে দুইটী মিঠা খিলি আনিয়া সুরেশের হাতে দিল। সুরেশচন্দ্র বলিলেন "কুন্দ! তোমার সুধাকণ্ঠের একখানি গান শুনাবে না?"

"কেন শোনাব না, কি গান গাহিব বলুন?" এই বলিয়া কুন্দ তাহার টেবল হারমনিয়মটী খুলিয়া বসিল।

একখানা ভাল দেখিয়া টপ্পা গাও বলিয়া সুরেশচন্দ্রও একখানি কাষ্ঠাসনে বসিলেন। কুন্দ তাহার বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর পঞ্চমেতে তুলিয়া গান ধরিল।

সিন্ধু—খাম্বাজ।

মনের মতন মানুষ যদি পাই।
বাঁধি কারে প্রেম, ডোরে যৌবনে জড়াই॥
মেথি আমেলা দিয়ে চুলে, সাজিয়ে খোঁপা বকুল ফুলে,
একটু খানি মুচকে হেসে দুবেলা তার মন যোগাই।



একবিংশ পরিচ্ছেদ

লোকে বলে কন্যা দায় অপেক্ষা আর দায় নাই। পিতৃ মাতৃ দায় তৎপরে। কিন্তু আমাদের হিমালয়বাবু সৌদামিনীর প্রেমের দায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গণিতেছিলেন। সৌদামিনী বিরহ, তিনি আর এক তিলও সহ্য করিতে পারিতেছেন না। আবার ভাবিতেছেন, তাইত সত্য সত্য বোবা হইয়া লোকালয়ে থাকি বা কিরূপে? আচ্ছা বায়না ছুঁড়ি নিয়েচে যা'হোক। ভাবিতে ভাবিতে হিমালয়বাবুর প্রস্রাবের ব্যায়রাম আসিয়া দেখা দিল, তথাপি কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। মদনের প্রহার অসহ্য বোধ হইলে, অবশেষে একদিবস তিনি হরিদাসীকে ডাকাইয়া বলিলেন—"যা হরিদাসি, বলে আয় ছয় মাসের জন্য বোবা হইয়া থাকিব।"

হরি। মন ঠিক করিয়া বলিবেন বাবু! দেখিবেন আমায় যেন পরে তাহার কাছে খেলো হইতে না হয়।

হিমা। মন ঠিক না করিয়া আর কি করি বল। আমি যে তাহাকে ভুলিতে পারিতেছি না।

হরি। সে কি ভুলিবার জিনিষ, যে আপনি অমনি মনে করিলেই ভুলিয়া যাবেন। সে হ'লো "আবার খাব" জাতীয়।

হিমা। যাও তবে আজকেই বন্দোবস্ত করিয়া আইস। ছয় মাসের অধিক নয় কিন্তু।

হরি। তা বরঞ্চ আমি চেষ্টা করে দেখ্‌চি, যাহাতে সে ছয় মাসে রাজী হয়। আপনার তো খুব সস্তায় হ'লো। লোকে যুগযুগান্তর ধরে তপস্যা করেও অমন রত্ন পায় না। ছয় মাস আর কটা দিন, ফুস্‌ করে চলে যাবে। তখন কি আর আমায় মনে থাকবে।

ছয় মাস পরে সৌদামিনী প্রাপ্তির আশায় হিমালয়বাবু আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়া হরিদাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা হরিদাসী সে দিন কি বলিল, আমায় ভালবাসে? হরিদাসী বলিল "একথা কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়। সেই বুড়ো-মড়াটাকে ভাল বাসিত, আর আপনার এত রূপ, এত গুণ, এত ধন, আপনাকে ভাল বাস্‌বে না?"

নষ্ট চরিত্রা হরিদাসীর সৌদামিনীকে কুপথে আনিতে খুব উৎসাহ দেখা যায়। সংসারের গতিই এইরূপ। লাঙ্গুল হীন শৃগাল সকলকেই লাঙ্গুলহীন দেখিতে ইচ্ছা করে। তাহার উপর আবার প্রতি সংবাদে দশ টাকা করিয়া পুরস্কারের লোভ হরিদাসীর পক্ষে সহজ কথা নয়। অপরাহ্নে হরিদাসী সৌদামিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমুদয় কথা বলিল এবং এই প্রস্তাবে রাজী হইলে ভবিষ্যতে সৌদামিনী যে রাজরাণী হইতে পারিবেন, তাহা বারে বারে বুঝাইয়া দিল। সৌদামিনী আর কোন আপত্য না উঠাইয়া ছয় মাসের কড়ারে রাজী হইলেন। কিন্তু বলিয়া দিলেন "যদি এই ছয় মাসের মধ্যে ভুলিয়াও একদিন একটী কথা

কাহারও সহিত কহেন, তবে সমস্ত পচিয়া যাইবে। আবার সেইদিন হইতে পুনরায় ছয় মাস বোবা হইয়া থাকিতে হইবে।"

"বাবা তুমি কি কড়া মেয়ে! ভগবান্ রূপ যৌবন দিয়েচেন বলে, কি এমনি নিষ্ঠুর হইতে হয়।" এই বলিয়া হরিদাসী একটু হাসিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল এবং হিমালয় সদনে উপস্থিত হইয়া সংবাদ আনয়নের জন্য দশ টাকা অগ্রিম হাতে লইয়া বলিল "কাজ হাঁসিল করিয়া আসিয়াছি। আপনি আর বিলম্ব করিবেন না। কাল দিন ভাল আছে। মা জগদম্বার নাম করে আপনি কাল হইতেই বোবা হইয়া পড়ুন। ছয় মাস দেখিতে দেখিতে চলিয়া যাইবে।"

হিমা। বিলম্বের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু হরিদাসি! খুব সাবধান এ সকল কথা যেন কোন ক্রমে প্রকাশ না হয়।

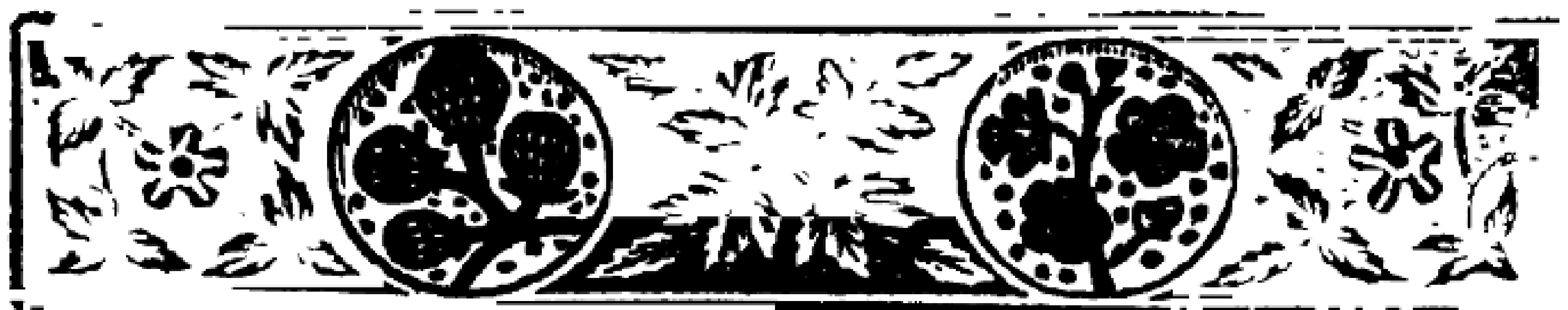
হরি। সে কথা আমাকে আর ব'লতে হবে না বাবু! তা'হলে আমার ব্যবসা চ'লবে কেন?

হিমা। দেখো হরিদাসী, এ কেবল তুমি জানিলে, আমি জানিলাম, আর সে জানিল।

হরিদাসী বলিল "আর তিনি জানিবেন।"

হিমা। তিনি কে? ও তুমি ঈশ্বরের কথা ব'লচ। ঈশ্বর কিশ্বর আমি মানি না, সে জন্য ভয় করি না।





দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

—∘⁘✻⁘∘—

"বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী।" নগেন্দ্র ব্যবসায় দিনে দিনে উন্নতিলাভ করিতেছিলেন। তিনি হরেন্দ্রের টাকা পরিশোধ করিয়াছেন। কারবার হইতে এক্ষণে তাঁহার মাসিক পাঁচ শত টাকা আয় দাঁড়াইয়াছে। নগেন্দ্র—দাস, দাসী নিযুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে প্রভাবতী তাঁহার ক্ষুদ্রসংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, তাঁহাকে এক্ষণে আর বৃষ্টিতে ভিজিয়া বাসি পাঠ সারিতে হয় না। বেলা হয়ে গেল, আফিসের ভাত চড়ান হ'লো না বলিয়াও ভাবিত হইতে হয় না। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার আর এক দুঃখ উপস্থিত হয়েছে। এক্ষণে তাঁহার অদৃষ্টে নগেন্দ্রের সাক্ষাৎ লাভ বড় একটা ঘটিয়া উঠে না। কদাচ ঘটিলে, উহা অতি অল্প সময়ের জন্য। তাহাতে সংসারের কোন কথা, বা কোন পরামর্শ হয় না। এজন্য প্রভাবতী বড় দুঃখিত আছেন। নগেন্দ্র দিবারাত্র আপনার ব্যবসা সম্বন্ধীয় কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন। কর্ম্মস্থান হইতে বাটি ফিরিতে তাঁহার প্রায় রাত্রি এগারটা বাজিয়া যায়। আবার সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আপন কাজকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়। অসম্ভব পরিশ্রম করিতে না পারিলে

ব্যবসায় উন্নতি করিতে পারা যায় না। চাকুরি ও ব্যবসায় অনেক প্রভেদ। এসকল কথা প্রভাবতী বুঝিতে চাহেন না। তাঁহার ইচ্ছা সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর স্বামীর সহিত দুইটা কথা কহেন। বিশেষতঃ আগামী মাসে ফণির উপনয়ন হইবে, এই তাঁহাদের প্রথম কার্য্য। প্রভাবতী স্বামীর সহিত পরামর্শ করিবেন, কিরূপ ঘটা করিয়া কার্য্য হইবে, কত লোক জন বলা হইবে। প্রভাবতী ইচ্ছা করিয়াছেন যে এই কার্য্যোপলক্ষে তিনি তাঁহার বাপের বাড়ীর গ্রামস্থ সকল লোকগুলিকে বলিলেন। কিন্তু নগেন্দ্রর সহিত এ বিষয়ে একবার পরামর্শ করা দরকার। নগেন্দ্রর বাটী ফিরিতে রাত্রি এগারটা বাজিয়া যায়। তাহার পর আহারাদি করিয়া শয়ন করেন। প্রভাবতী পদসেবা করিতে করিতে কত কথা কহিতে থাকেন; তাহার পর হঠাৎ দেখেন নাসিকা-ধ্বনি হইতেছে। এজন্য নগেন্দ্র যাবজ্জীবন প্রভাবতীর নিকট লজ্জিত ছিলেন। কিন্তু ইহার কখন কোন প্রতিকারও করিতে পারেন নাই। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া রাত্রে আহারের পর শয়ন করিলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইত। প্রভাবতী পদসেবা করিতে করিতে কত কথা জিজ্ঞাসা করেন এবং "ঘুমাইলে"? বলিয়া মাঝে মাঝে নগেন্দ্রর সাড়া লয়েন। ঘুমাচ্ছন্ন নগেন্দ্র পাছে প্রভাবতী মনে দুঃখ করেন বলিয়া বলেন "না ঘুমাব কেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার কথার উত্তরে "হু", "সে মন্দ নয়", "তা মিথ্যা নয়" ইত্যাদি সাড়া দিয়া থাকেন। অনেক সময়ে এই প্রকার উত্তর গুলি ঠিক লাগিত। কিন্তু এক, এক সময়ে এরূপ অসঙ্গত হইত

যে প্রভাবতী অবাক হইয়া যাইতেন এবং তিনও ধরা পড়িতেন। এক দিবস ঐরূপ অবস্থায় প্রভাবতী দুঃখের কাহিনী গাহিতেছিলেন। তিনি বলিলেন "তুমি আমায় দেখিতে পার না তাই।" উত্তরে নগেন্দ্র বলিলেন "কথাটা মিথ্যা নয়।" প্রভাবতী বলিলেন "আমি মলে তোমার পাপ চুকে যায়।" নগেন্দ্র উত্তর দিলেন "হুঁ সে কথা ঠিক।" এইরূপ উত্তর সকল শুনিয়া প্রভাবতী অভিমানে কাঁদিতে কাঁদিতে আপন শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলেন। ইহার পর অভিমান ভাঙ্গিতে নগেন্দ্রকে অনেক পরিশ্রম ও পয়সা ব্যয় করিতে হইয়াছিল।

যাহা হউক আজ সকালে প্রভাবতী নগেন্দ্রকে বড় গ্রেপ্তার করিয়াছেন। আজ সকাল বেলা আটটার পর হরেন্দ্রের আসিবার কথা ছিল। তাহারই প্রতীক্ষায় নগেন্দ্র আজ বাটীতে ছিলেন। নগেন্দ্রকে একাকী পাইয়া প্রভাবতী দস্তুর মতন আঁখি ঘুরাইয়া বলিলেন "তোমার ব্যাপারখানা কি বল দেখি?"

নগে। কেন, কি হয়েচে, হুজুরে কি কোন অপরাধ করিয়াছি।

প্রভা। আজ কাল বাটী আসিতে তোমার এত রাত হয় কেন?

নগে। কেন, তোমার কি আমার চরিত্রে সন্দেহ হয় না কি?

প্রভা। তোমার চরিত্রে সন্দেহ হইবার পূর্ব্বে যেন মা গঙ্গা আমায় ডাকিয়া লয়েন। তবে অভাগিনীর কপাল দোষে—

নগে। প্রভাবতী! আমি যে চাষ্নি ছেলের বাপ হ'লাম।

প্রভা। চারি ছেলের বাপ হইলে বলিয়া গরব করিও না, বাহিরে পাঁচ ছেলের মাও অনেক আছে।

নগেন্দ্র পরাজয় স্বীকার করিয়া আনন্দ চিত্তে প্রভাবতীর বদন কমলে সকাল বেলা একটী চুম্বনরেখা অঙ্কিত করিয়া দিলেন।

মানুষের স্বভাব কেহ কাহারও নিকট পরাভূত হইলে, তাহার উপর রাগ হয়। তাহাকে গালি দেয়, তাহার অনিষ্ট চেষ্টা করে। কিন্তু কেবল মাত্র এই প্রকার দুই এক ক্ষেত্রে দেখা যায়, যেখানে মানুষ পরাভূত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রশংসা করে এবং মনে মনে অশেষ সুখানুভব করিয়া থাকে।

প্রভাবতী ফণির পৈতার কথাটী পাড়িয়াছেন মাত্র এমন সময় বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল হরেন্দ্রবাবু আসিয়াছেন। প্রভাবতী বলিলেন "তোমার হরেন্দ্রের সঙ্গে আমার শত্রুতা আছে না কি ?"

নগে। প্রভাবতী ও কথা বলিও না, দেখ আমাদের যাহা কিছু উন্নতি দেখিতেছ, সকলই হরেন্দ্রের জন্য জানিবে।

প্রভা। তাইত সে জ্ঞানটুকু তো বেশ আছে দেখছি। কিন্তু এক দিন তো হরেন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করে ভাল করে খাইয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে দেখিলাম না।

নগে। ও তাহাতে আর কি হইয়াছে। আচ্ছা আজ তো আসিয়াছে, তুমি ভাল করে খাওয়াও না ?

প্রভাবতী হরেন্দ্রের আহারের উদ্যোগে প্রস্থান করিলেন। হরেন্দ্র আসিয়া নগেন্দ্রের নিকট বসিলেন এবং সুরেশচন্দ্রের থিয়েটারঘটিত কাণ্ড সকল নগেন্দ্রকে শুনাইয়া ভয়ানক রকম



প্রভাবতী বলিলেন—"চারি ছেলের বাপ হইলে বলিয়া গরব করিও না, বাহিরে পাঁচ ছেলের মাও অনেক আছে।" ১২০ পৃষ্ঠা।

বৈঠকি হাসি হাঁসিতে লাগিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন—"আজ তোমাকে এখানে খাইতে হইবে। প্রভাবতী নিমন্ত্রণ করিয়াছে।" ভোজনের নিমন্ত্রণ পাইয়া হরেন্দ্র বলিলেন—"শুনিয়া সুখী হইলাম, যে তোমাদের ধর্ম্মে মতি হইয়াছে!"





ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

বেলা নয়টা বাজিতে যায়, তথাপি হিমালয় বাবু শয্যা ত্যাগ করেন নাই। আফিস যাইবার কোনও উদ্যোগ নাই দেখিয়া, গৃহিণী আসিয়া তাগাদা করিয়া গেলেন। হিমালয়বাবু কিন্তু কোন উত্তর করিলেন না। পুর্ব্ববৎ জড়ভরতের মতন বসিয়া রহিলেন। ক্রমে বেলা দশটা বাজিল। নরেশচন্দ্র আহার করিয়া আফিস চলিয়া গেলেন। গৃহিণী পুনরায় আসিয়া বলিলেন,—"তোমার কি হইয়াছে—কোন উত্তর নাই। আফিস যাইবে না আজ?"—কোন উত্তর নাই। "অসুখ করিয়াছে কি?"—কোন উত্তর নাই। কেবল মাত্র মস্তক সঞ্চালন দ্বারা হিমালয়বাবু গৃহিণীকে জানাইলেন, যে তাঁহার অসুখ করিয়াছে।

"তবে আজ আর আফিস যাইও না" এই বলিয়া গৃহিণী আপন কার্য্যে চলিয়া গেলেন। কিয়ৎকাল পরে গৃহিণী তাঁহার সংসারের কাজ কর্ম্ম সারিয়া আসিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কি খাইবে"—কোন উত্তর নাই। "সাগু করিয়া দিব কি?"—পূর্ব্ববৎ কোন উত্তর নাই। গৃহিণী তখন নিকটে

আসিয়া "তোমার কি হইয়াছে, কথা কহিতেছ না কেন" প্রভৃতি কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু হিমালয়বাবু কোন কথার উত্তর দিলেন না, কেবল দুই একবার মস্তক সঞ্চালন করিলেন মাত্র।

হিমালয়বাবুর ঈদৃশ ব্যবহারে গৃহিণী অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি তো আর জানেন না, যে তাঁহার স্বামী নূতন রকমের প্রেম করিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, বুঝি তিনি কোন অপরাধ করিয়া থাকিবেন, তাই তাঁহার স্বামী রাগ করিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন না। তখন তিনি স্বামীর পায় ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"আমার উপর রাগ করিয়াছ কেন? আমি যদি কিছু দোষ করিয়া থাকি, তবে আমায় ক্ষমা কর। তুমি স্বামী, তুমি না মার্জ্জনা করিলে আমার কি হইবে।" গৃহিণীর অবস্থা দেখিয়া হিমালয়বাবুর মনে দুঃখ হইতে লাগিল। এক একবার ইচ্ছা হইতেছিল, যে কথা কহেন, কিন্তু তখনি আবার সৌদামিনীর রূপ লাবণ্য তাঁহার নয়ন পথে উদিত হইয়া বলিতেছিল—"বেশ কথা কও না—কিন্তু আমার আশা তা'হলে আর করিও না।" কাজেই হিমালয়বাবুকে মনের ইচ্ছা মনেই দমন করিয়া রাখিতে হইল। অনেক সাধ্য সাধনা করিয়াও গৃহিণী হিমালয়-বাবুকে একটীও কথা কহাইতে পারিলেন না।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নরেশচন্দ্র আফিস হইতে বাটী আসিয়া দেখিলেন, মাতা ধূলায় পড়িয়া আছেন, পিতা গম্ভীর বদনে বসিয়া আছেন। তাঁহার আফিস না যাইবার হেতু জিজ্ঞাসা করিলে হিমালয়বাবু একখণ্ড কাগজে লিখিয়া দিলেন যে

হঠাৎ তাহার কণ্ঠস্বর বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনি কথা কহিতে পারিতেছেন না।

হিমালয়চন্দ্রের হস্তাক্ষর পাঠ করিয়া নরেশচন্দ্র আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া "ডাক্তার লইয়া আসি "বলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে, তাঁহার জননী জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে আমায় বলিয়া যাও।" নরেশচন্দ্র তখন জননীকে পিতার হঠাৎ বাক্‌রোধ ব্যাধি হইয়াছে জানাইয়া দ্রুত ডাক্তার আনিতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার জননী শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—"হায় কেন আমার এমন সর্ব্বনাশ হইল, আমি তো কখনও কাহারও মন্দ করি নাই।" নরেশচন্দ্র অচিরে ডাক্তার লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। ডাক্তার বাবুর আগমনে, গৃহিণী সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

ডাক্তার বাবু এক্ষণে হিমালয় বাবুর নিকটে গিয়া তাঁহাকে মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেক প্রকার যন্ত্র-পাতি বাহির করিয়া অনেক রকম কায়দা করিয়া পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া বলিলেন,—"কাগজ কলম আন।" নরেশচন্দ্র কাগজ কলম লইয়া আসিলে ডাক্তার বাবু প্রেস্‌ক্রিপ্সন (Prescription) লিখিতে বসিলেন। প্রেস্‌ক্রিপ্সন লেখা হইলে ডাক্তার মহাশয় নরেশচন্দ্রকে বলিলেন,—"দেখুন ইহাতে দুইটা ঔষধ লিখিয়া দিলাম। প্রথমটা আনিয়ে এখনি একদাগ খাওয়াইয়া দিন, তাহাতে যদি কোন কাজ না হয়, তাহা হইলে এই দ্বিতীয় ঔষধটা দুই ঘণ্টা পরে খাওয়াইয়া দিবেন।

আর রোগীকে একটু সাবধানে রাখিবেন। পথ্য যেরূপ উঁহার রুচি হইবে সেইরূপ দিবেন।” এই বলিয়া ডাক্তার বাবু তাড়াতাড়ি উঠিলেন। নরেশচন্দ্রও তাঁহার সঙ্গে বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কিরূপ দেখিলেন, কি জন্য হঠাৎ এরূপ হইল।” ডাক্তার বাবু তখন পেণ্টুলেনের পকেটের মধ্যে দুই হাত প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—“কি জন্য এরূপ হইল, তাহা ঠিক বোঝা গেল না। However আপনি ঔষধটা খাইয়ে দেখুন কেমন থাকেন।” তৎপরে ডাক্তার বাবু যোলোটী টাকা দর্শনি পকেটে ফেলিয়া দ্রুত গাড়িতে উঠিলেন। নরেশচন্দ্র অবাক্ হইয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভাবিলেন এ মন্দ নয়। রোগ নির্ণয় হইল না, অথচ ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। গৃহিণী শুনিয়া বলিলেন “ও ডাক্তার কোন কাজের নয়, তুমি অন্য ডাক্তার লইয়া আইস —একজন সাহেব ডাক্তার লইয়া আইস।” গৃহিণীর ইচ্ছানুসারে সাহেব ডাক্তার আসিলেন। তিনিও রোগীকে অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কিন্তু কি জন্য যে হিমালয় বাবুর হাঠাৎ কণ্ঠস্বর রোধ হইয়াছে, তাহার কোন মীমাংসা করিতে পারিলেন না। তিনিও ঔষধ দিলেন, দুই চারি দিন সেবন করান হইল; কিন্তু কোনরূপ উপকার হইল না। হিমালয় বাবু কাগজে লিখিয়া দুই এক বার জানাইলেন, যে ডাক্তার বৈদ্য আনিতে হইবে না। কিন্তু গৃহিণী নিষেধ শুনিলেন না। হিমালয় বাবুও ধরা পড়িবার ভয়ে অধিক আপত্য করিলেন না।

অনেক ডাক্তার বদলান হইল। কিন্তু কোন ফল দর্শিল না

দেখিয়া, তখন কবিরাজ দেখাইবার ব্যবস্থা হইল। নরেশচন্দ্র একজন প্রবীণ কবিরাজ লইয়া আসিলেন। তিনি নরেশচন্দ্রের নিকট পথে সমুদয় ঘটনা শুনিয়াছিলেন, তথাপি রোগীর নাড়ী টিপিয়াই বলিলেন, ইহার বাক্‌রোধ ব্যাধি হইয়াছে। কবিরাজ মহাশয়ের নাড়ী জ্ঞান দেখিয়া সকলে অনেক প্রশংসা করিলেন। হিমালয় বাবুরও ইচ্ছা হইতেছিল যে, তিনি কবিরাজ মহাশয়কে একবার ধন্যবাদ দেন কিন্তু উপায় নাই, সুতরাং নীরবে রহিলেন।

কবিরাজ মহাশয় এইবার রোগীকে জেরা আরম্ভ করিলেন—"আপনার কি কখন 'সিভিলিস' হইয়াছিল।" হিমালয় বাবু মস্তক সঞ্চালন দ্বারা জানাইলেন যে "না"। কবিরাজ পুনরায় বলিলেন কখন হয় নাই, বেশ করিয়া মনে করে দেখুন দিকি, খুব ছেলেবেলায়, চারি পাঁচ বৎসর বয়সেও কি কখন হয় নাই। রোগী সঙ্কেত দ্বারা জানাইলেন "না।" কবিরাজ মহাশয় আর কোন প্রশ্ন না করিয়া ব্যাগ হইতে কয়েকটী বড়ী বাহির করিয়া বলিলেন,—"দুই দিনের ঔষধ দিলাম। অর্দ্ধহস্ত পরিমিত যে পটল, সেই পটলের রস আর খাঁটি মধুর সঙ্গে এই বটিকা মাড়িয়া খাওয়াইবেন। পরে কেমন থাকেন আমায় সংবাদ দিবেন।

হিমালয় বাবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিত্য নূতন ডাক্তার বৈদ্য আসিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই রোগের কোন নিরূপণ করিতে পারিলেন না। হিমালয় বাবু বারে বারে কাগজে লিখিয়া জানাইলেন,—"মিছে ডাক্তার বৈদ্য আনিয়া পয়সা নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। দিন কতক পরে আপনি

সারিতে পারে। কিন্তু গৃহিণী কোন কথাই শুনিলেন না। তিনি আপন পুঁজির টাকা হইতে ডাক্তার বৈদ্য আনাইতে লাগিলেন। নরেশচন্দ্র আফিসে বড় সাহেবকে পিতার অসুখের কথা জানাইয়া ছয় মাস ছুটি মঞ্জুর করাইয়া আনিলেন। চিকিৎসা চলিতে লাগিল। ডাক্তার বৈদ্য আসেন যায়েন, ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যান, কিন্তু হিমালয় বাবু কোন ঔষধ সেবন করেন না।





চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

—ঃ*ঃ—

সুরেশচন্দ্র নিজগুণেই বলিতে হইবে,—অতি অল্প দিনের মধ্যে কুন্দকে অনেকখানি ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছিলেন. এবং তাঁহার বিশ্বাস কুন্দও তাঁহাকে খুব ভাল বাসে। কথা প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার বন্ধু হরেন্দ্রের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন, যে কুন্দ বারবিলাসিনী নয়। সে শাপভ্রষ্টা রমণী-রতন। পূর্ব্ব জন্মে কুন্দ তাঁহার বিবাহিতা পত্নী ছিল। "বারবিলাসিনীর পবিত্র প্রণয়" বলিয়া একটা প্রবন্ধও তাঁহার কাগজে বাহির করিয়াছিলেন। তিন চারি মাসের মধ্যে সুরেশচন্দ্রের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল! তিনি এক্ষণে এক তিলও কুন্দের বিরহ সহিতে পারেন না। এক্ষণে তাঁহার শয়ন, ভোজন প্রভৃতি সকল কার্য্যই কুন্দালয়ে হইতেছিল। এক একবার কার্য্যালয়ে না যাইলে নয়, তাই বাধ্য হইয়া যাইতেন। কিন্তু কুন্দ-প্রণয়াগ্নিতে টাকারূপ ঘৃতাহুতির প্রয়োজন। টাকা কোথা হইতে আসে। সুরেশচন্দ্রের এক পয়সাও রোজগার নাই। কাগজ খানিতে কেবল দেনা বৃদ্ধি হইতেছিল বই, এক পয়সাও আয় হয় নাই। তাঁহার পিতার

অসুখের সংবাদ পাইয়া দেখিতে গিয়াছিলেন। তথায় মাতার নিকট গোপনে এক হাজার টাকা চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা সে সময়ে অত টাকা দিতে সম্মত না হওয়ায়, সুরেশচন্দ্র জননীর গহনার বাক্সটী না বলিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন এবং উহাই ভাঙ্গাইয়া উপস্থিত কুন্দ প্রণয়ে আহুতি প্রদান করিতেছিলেন। সুরেশচন্দ্র এ কার্য্যে নূতন—অযথা অর্থ ব্যয় করিয়া কুন্দের মাতার নিকট যথেষ্ট নাম কিনিয়াছিলেন। কুন্দের প্রতিবেশিনীগণও তাঁহার নাম করিয়া থাকে। কিন্তু কতদিন যে তিনি এ ভাবে চালাইতে পারিবেন, তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর তাঁহার ছিল না। সুরেশচন্দ্রের অবস্থায় পড়িয়া কেহ তাহা পারেও না। এখন কেবল "চালাও পান্‌সী" এই বুলি তাঁহার মুখে। পরিণাম যে ভরাডুবি, তাহা সুরেশচন্দ্রকে এখন কে বুঝাইবে?

একণে আবার তাঁহার বন্ধুবর্গ জুটিয়াছে। তিনি বোতল-বিহারিণীর সেবা করিতে শিখিয়াছেন। অদ্য সন্ধ্যার পর সুরেশচন্দ্র বোতল বিহারিণীর সেবা করিতেছিলেন, এমন সময় কুন্দ লোকবিমোহন সাজে সজ্জিত হইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। কুন্দকে দেখিয়া সুরেশ বলিলেন—"কুন্দ তুমি কি কঠিন। আমি যে তোমার বিরহে কাটা পাঁঠার মত ছট ফট করিতেছি। তুমি কোথায় গিয়াছিলে?"

"এই যে তোমার জন্য পান সাজিতেছিলাম, সেই জন্য একটু বিলম্ব হইল।" এই বলিয়া কুন্দ একটী পানের খিলি সুরেশচন্দ্রের বদনে ধরিল। সুরেশচন্দ্র আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিলেন—"কুন্দ সত্য কি তুমি আমায় ভালবাস?"

কুন্দ। কতদিন তো বলিয়াছি ভালবাসি। প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি। তবে—

বাধা দিয়া সুরেশচন্দ্র বলিলেন—"ইহার ভিতর আবার "তবে" আন কেন? তুমি আমায় ভালবাস, ইহার ভিতর "তবে, কিন্তু" প্রভৃতি শব্দ শুনিতে চাহি্ না। চাহি কেবল তোমার খাঁটি ভালবাসা। অবিশ্রান্ত ভালবাসা।"

কুন্দ। তাই বলিতেছিলাম। লোক বলে যে গয়লা বাড়ি খাঁটি দুধ পাওয়া যায় না--চাইলে কি হবে, আর দুনো দাম দিলেই বা কি হবে।

সুরে। না না, আমি সে প্রকৃতির লোক নহে, ওসকল কথা গ্রাহ্য করি না। স্ত্রী ভালবাসিবে, সে আর বেশি কথা কি? সে তো ভালবাসিতে বাধ্য। তাহার রূপ নাই, গুণ নাই, ভালবাসিবে না তো কি করিবে। তোমার মতন গুণবতী, সুন্দরী যদি ভাল না বাসিল, তবে আর জীবনের মূল্য কি।

কুন্দ। লোকে বলে আমাদের ভালবাসা, জলের লিখনের ন্যায় অস্থায়ী।

সুরে। তার মানে কি জান? যতদিন আমরা পয়সা যোগাইতে পারি, ততদিন তোমরা ভালবাস। পয়সা ফুরাইয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ভালবাসাও ফুরাইয়া যায়।

"দেখ, দেখি কত বড় একটা কলঙ্কের কথা তোমরা আমাদের উপর চাপাইয়া রাখিয়াছ।" এই বলিয়া কুন্দ ছল ছল নেত্রে সুরেশচন্দ্রের প্রতি একটি কটাক্ষ করিল।

কুন্দের ভাব দেখিয়া সুরেশবাবু মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন

—"বাস্তবিক এটা বড় অন্যায়। সকলেই কি এক রকম। আচ্ছা আমি শীঘ্রই এবিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া জনসাধারণের সম্মুখে ধরিতেছি। কুন্দ তুমি দুঃখ করিও না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমার পয়সা ফুরাইয়া গেলে, তুমি অপরাপর হৃদয়-হীনার ন্যায় আমাকে তাড়াইয়া দিবে না। চিরকাল সমান ভালবাসিবে।"

কুন্দ। ভবিষ্যতে কি করিব, কি হইবে, সে কথা আমি তোমায় দিব্য করিয়া বলিতে পারি না। এখন তোমায় প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি, তোমার অদর্শনে পাগলিনীর ন্যায় পথ পানে চাহিয়া থাকি, দেখিয়া থাকিবে বোধ হয়। তবে পরে যদি আমার মাথা খারাপ হইয়া যায়, তখন আমি কি করিব, সে কথা এখন কিরূপে বলিতে পারি। তখন হয়ত তোমাকে দেখিলে কামড়াইতে যাইব।

সুরে। ও সকল কথায় আর কাজ নাই। কুন্দ তুমি একখানি গান গাও, আমি তোমার কণ্ঠ-সুধা পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করি।





পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।



দেখিতে দেখিতে পাঁচ মাস উত্তীর্ণ হইয়া গেল, অনেক ডাক্তার, বৈদ্য, হিমালয় বাবুকে দেখিলেন, কিন্তু তাঁহার রোগের কোন উপশম হইল না। অবশেষে ডাক্তার বৈদ্যে বীতশ্রদ্ধ হইয়া দৈবের আশ্রয় গ্রহণ করা হইল। গৃহিণী স্বামীর আরোগ্য কারণ ৺তারকনাথে হত্যা দিয়া আসিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না। নানাপ্রকার জল-পড়া খাওয়ান হইল, সন্ন্যাসী-প্রদত্ত মাতুলীও অনেকগুলি হিমালয় বাবুর হাতে, কটিদেশে, কণ্ঠদেশে শোভা পাইতে লাগিল। সম্প্রতি দুই একজন ওঝা আসিয়া ঝাড়ফুক করিয়া গিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। আজ সন্ধ্যার সময়ে একজন খুব বিজ্ঞ ওঝার আসিবার কথা আছে। ওঝা বলিয়াছেন কোন ভয় নাই, তিনি ঝাড়িয়া ফুকিয়া নিশ্চয় হিমালয় বাবুকে ব্যাধি মুক্ত করিয়া দিবেন। হরিদাসী চুপে চুপে এই অদ্ভুতক্ষমতাপন্ন ওঝার সংবাদ গৃহিণীকে আনিয়া দিয়াছে। এই ওঝার উপর সকলের খুব বিশ্বাসও জন্মাইয়াছিল! কারণ ওঝা বলিয়াছে, তাহাকে এক পয়সাও দিতে হইবে না। রোগ আরোগ্য হইলে, কেবলমাত্র পরী-

রাণীর পূজা দিতে হইবে। রোগীকে পরীতে পাইয়াছে। ওঝা আরও বলিয়া দিয়াছেন, যে শনিবার ভরা সন্ধ্যাকালে ঝাড়িতে হইবে। ঐ দিবস রোগীকে তেলহলুদ মাখাইয়া স্নান করাইতে হইবে এবং একখানি নববস্ত্র পরিধান করিয়া খোলা গায়ে সারাদিন উপবাসে থাকিতে হইবে। কপালে একটী সিন্দূরের রেখা দিতে হইবে। তামাসা দেখিতে অনেক-গুলি নর নারী আজ সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে হিমালয় বাবুদের বাটীতে জড় হইয়াছিলেন। গৃহিণী ওঝার উপদেশানুসারে সমস্ত কার্য্য করিয়া রাখিয়াছেন। কপালে সিন্দুরের ফোঁটা দিবার সময়ে হিমালয় বাবু মনে করিলেন, এ আবার কি, হাড়কাঠে মাথা দিতে হবে নাকি?

ঠিক সন্ধ্যার সময়ে ওঝা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ওঝার আপাদমস্তক দাড়ি, মাথায় ভীষণ জটা, পরিধানে বাঘছাল। গৃহিণী ভক্তিসহকারে ওঝা মহাশয়কে বসিতে আসন পাতিয়া দিলেন, কিন্তু ওঝা-মহাশয় বসিলেন না। বলিলেন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া লগ্নভ্রষ্ট হইয়া গেলে মন্ত্র ফলিবে না। লগ্নভ্রষ্টের কথা শুনিয়া হরিদাসী বিদ্রুপের স্বরে বলিল "ওঝা-মহাশয় কি বাবুর বিয়ে দিতে এসেছেন নাকি?" যাহা হউক ওঝাকে তৎক্ষণাৎ রোগীর কক্ষ দেখাইয়া দেওয়া হইল। ওঝা বলিলেন "আপনারা ঘরের মধ্যে কেহ যাইবেন না, বাহির হইতে সকলে দেখুন।" ওঝার হাতে একগাছি বৃহদাকার সম্মার্জ্জনী ছিল, তাহাতে কতকগুলি লতাপাতা জড়ান ছিল। ওঝা বলিলেন "মন্ত্র পাঠকালে ইহার দ্বারা রোগীকে মাঝে মাঝে আঘাত করিতে হইবে, সেজন্ত আপনারা কোনরূপ উদ্বিগ্ন

হইবেন না।" এইরূপে দর্শকমণ্ডলীকে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া ওঝা-মহাশয় রোগীর কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন এবং আচম্বিতে রোগীর পৃষ্ঠে এরূপ সবলে সম্মার্জ্জনী নিক্ষেপ করিলেন যে রোগী "বাপ্‌রে" করিয়া উঠিল। বাহিরের জনতামণ্ডলী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "ঐ যে কথা কহিয়াছে।" ওঝা-মহাশয় উচ্চ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ সম্মার্জ্জনী প্রহার করিতে লাগিলেন। ওঝা-মহাশয় মন্ত্রগুলি কিছু নিম্নস্বরে পাঠ করিতেছিলেন। উহা এইপ্রকার :—

ব্রাহ্মণের বিধবা—বল্ মা। পুরোহিত পত্নী—বল্ মা। এইরূপ মন্ত্র পাঠ হইতেছে ও তদসঙ্গে জলবিছুটিসহ সম্মার্জ্জনীর ছিটা দেওয়া হইতেছিল। চারি পাঁচ মাস বাক্যালাপ বন্ধ থাকায়, প্রথমটা হিমালয় বাবুর বাক্য সরিতেছিল না। তিনি প্রহারের ধমকে অঁ্যা অঁ্যা, গোঁ গোঁ, করিতে লাগিলেন। পরে মা মা বলিয়া ওঝার পা জড়াইয়া ধরিলেন। ওঝা বলপূর্ব্বক পা সরাইয়া লইয়া দ্বার খুলিয়া একলম্ফে বাহিরে আসিয়া পড়িলেন এবং গৃহিণীকে বলিলেন "রোগ সারিয়া গিয়াছে, এক্ষণে আপনারা গিয়া রোগীর একটু শুশ্রূষা করুন্‌গে।" তখন গৃহিণীর সঙ্গে সকল লোক হুড়াহুড়ী করিয়া হিমালয় বাবুকে দেখিতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ওঝা-মহাশয় সেই অবসরে সেখান হইতে অন্তর্ধান হইলেন!

একে সারাদিন অনাহার, তায় জলবিছুটিসহ সম্মার্জ্জনীর ভীষণ প্রহারে হিমালয় বাবু যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। গৃহিণী স্বামীর মাথা ক্রোড়ে রাখিয়া



ওঝা মহাশয় তখন মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ সম্মার্জ্জনী প্রহার করিতে লাগিলেন।

১৩৪ পৃষ্ঠা

মুখে চোখে জল সেচন করিতে লাগিলেন। হরিদাসী ঝি একখানি তালবৃন্ত লইয়া হিমালয় বাবুকে বাতাস দিতে লাগিল। কিয়ৎকাল এইরূপ করিবার পরে হিমালয় বাবুর চেতনা হইল। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন "উঃ বড় পিপাসা—একটু জল দাও।" তৎক্ষণাৎ রূপার গ্লাসে হিমালয় বাবুর শ্বাশুড়ীঠাকরুণ, জল আনিয়া দিলেন। হিমালয় বাবুকে কথা কহিতে দেখিয়া গৃহিণী গললগ্নকৃতবাস হইয়া দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিলেন "মা জগদম্বা রক্ষা করিয়াছেন, আর ভয় নাই।"

যাহা হউক গৃহিণীর যত্ন ও চেষ্টায় হিমালয় বাবু রোগ মুক্ত হইলেন, কিন্তু গৃহিণীর উপর প্রথমটা তাঁহার অত্যন্ত রাগ হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই হতভাগী মাগীর জন্যই তাঁহার এই দুর্দ্দশা হইল। কিন্তু পরে যখন ওঝার মন্ত্রগুলি তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে সমস্ত সৌদামিনীর খেলা। আর হরিদাসী সিন্নিও খাইয়াছে, ভরাও ডুবাইয়াছে। দুঃখে, শোকে, অপমানে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু কি করিবেন উপায় নাই। কারণ ইহা লইয়া হৈচৈ করিতে গেলে, আরও অপদস্থ হইতে হইবে, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন।

হিমালয় বাবু যখন বলিয়াছিলেন "দেখো হরিদাসী, একথা তুমি জানিলে, আমি জানিলাম, আর সৌদামিনী জানিল, আর যেন কেহ না জানে। তদুত্তরে হরিদাসী বলিয়াছিল "আর তিনি সকল জানিবেন।" হিমালয় বাবু

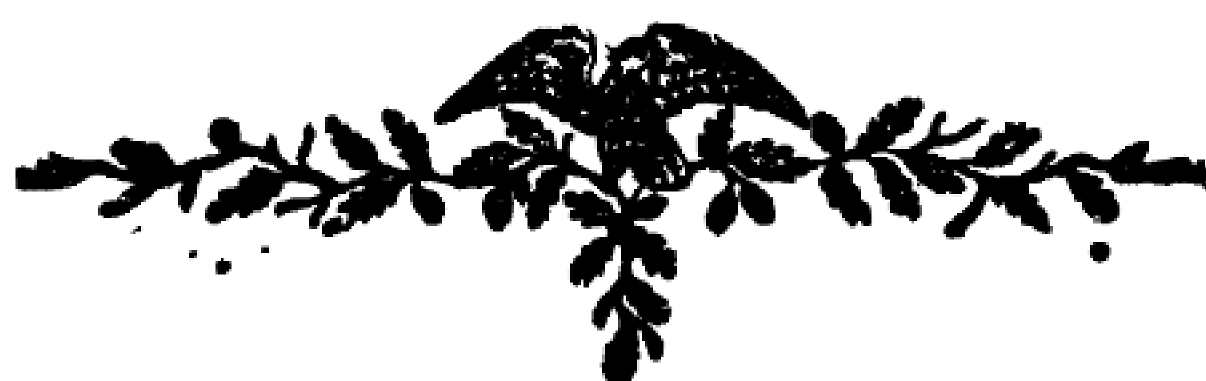
ভাবিয়াছিলেন, হরিদাসী বুঝি পরমেশ্বরের কথা বলিতেছে। কিন্তু হরিদাসীর এ "তিনি" যে পরম পিতা পরমেশ্বর নহেন তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। এ "তিনি" হরিদাসীর মনচোরা আমাদের কেশবচন্দ্র। হরিদাসী কাহার নিকট কোনও কথা বলে নাই। কিন্তু কেশবকে না বলিলে, যদি তাহার কোনরূপ পেটের গোলমাল হয় এই ভয়ে, বোধ হয় সে সমুদয় বৃত্তান্ত কেশবচন্দ্রকে বলিতে বাধ্য হইয়াছিল। হরিদাসীর নিকটে সমুদয় ঘটনা শুনিয়া, হিমালয়ের প্রতি কেশবের অতিশয় ক্রোধের উদয় হইল। সে মনে মনে বলিল যে, "আমি পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের অনেক নুন খাইয়াছি। আমি জীবিত থাকিতে কখনই এ ব্যাপার ঘটিতে দিব না। হিমালয়চন্দ্রকে তাহার দুরভিসন্ধির জন্য কিছু শিক্ষা দিবার বাসনা তাহার হৃদয় মধ্যে জাগরুক হইয়া উঠিল। পরে হরিদাসীর সাহায্যে যথাসময়ে ওঝা সাজিয়া কেশব হিমালয় বাবুকে কিরূপে রোগমুক্ত করিয়া দিয়া আসিয়াছে, পাঠক তাহা অবগত আছেন।

অনেক ডাক্তার, বৈদ্যে হিমালয় বাবুর যে ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারেন নাই, কেশবচন্দ্র তাহা অবলীলাক্রমে আরোগ্য করিল। কেশবচন্দ্র রোগ চিনিয়াছিল এবং ঠিক ঔষধও প্রয়োগ করিয়াছিল। সুতরাং পাঁচ মাসের পোষা ব্যায়রাম একদিনেই সারিয়া গেল।

হিমালয় বাবু রোগ মুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার রোগের কারণও পল্লিময় প্রচার হইয়া পড়িল—ইহাও কেশব ও হরিদাসীর খেলা। বড়রাণী সমুদয় শুনিলেন। তিনি

তখন আর একবার হিমালয় বাবুর সাত পুরুষকে নিমন্ত্রণ করিয়া উপাদেয় খাদ্য সকল খাওয়াইতে লাগিলেন। সৌদামিনী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল—কারণ ছয়মাস প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল। তাহার দুই নম্বরের ফাঁড়া কাটিল। সৌদামিনীর তিন নম্বরের ফাঁড়া কিছু ছিল কি না, তাহা আমরা অবগত নহি। পাড়ার ছেলেরা হিমালয় বাবুকে দেখিলেই "কে যায় ঐ প্রেমের বোবা" বলিয়া গোল করে। মেয়েরা স্নানের ঘাটে কমিটী করিয়া, ঐ কথাই কয়। ক্রমে ছেলেরা এরূপ বাড়াবাড়ী করিয়া তুলিল, যে হিমালয় বাবুকে শীঘ্রই কোন্নগর ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া বাসা ভাড়া করিয়া থাকিতে হইল। ধন্য কেশবচন্দ্র। তোমার ওঝাগিরিকে আমরা ধন্যবাদ দিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।

হিমালয় বাবুর গৃহিণীকেও আমরা ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি অজ্ঞাতে যাহা করিয়াছেন, যদি স্বামীর রোগের কারণ জানিয়া শুনিয়াও ঐ প্রকার যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা স্বামীকে ঐ প্রকার রোগ হইতে মুক্ত করিতেন, তাহা হইলেও নারীসমাজ তাঁহাকে কেহ দোষী করিতে পারিতেন না।





ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যদেব লোকলোচনের বহির্ভূত হইয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটীর ফরাসগণ মৈ-স্কন্ধে, আলোক হস্তে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া সন্ধ্যাদেবীর আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেছে। রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের ঘোড়ার ন্যায় ফরাসগণ মৈ রূপ জয়পতাকা স্কন্ধে এরূপ ভাবে রাস্তায় ছুটাছুটি করিতেছে যে, তাহাদের দেখিলে মনে হয়, যেন তাহারা বলিতেছে—'হে সব হুঁসিয়ার, সরে দাঁড়াও এক পাশে।' এমন সময়ে আমাদের প্রেমিক সম্পাদক সুরেশচন্দ্র ধীর পদবিক্ষেপে বিডন ষ্ট্রীটের পথে যাইতেছিলেন। হঠাৎ এক ফরাসের স্কন্ধস্থিত মৈ আসিয়া তাঁহার বক্ষে লাগিল—তিনি ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। তিনি চিন্তামগ্ন থাকায় ফরাসের আজ্ঞা শুনিতে পান নাই। তাড়াতাড়ী গাত্রোত্থান করতঃ অঙ্গের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে, তিনি ফরাসকে "উল্লুক, গাধা, আঁখ নেহি হায়" প্রভৃতি বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ফরাস বলিল—"হুজুর হামারা কেয়া কসুর, হাম তো ফুকরাতা—বাঁচকে বাঁচকে। খেয়াল রাখকে রাস্তা চল্‌না চাহি—চল্‌নেকা বখৎ রাস্তামে

থাপসুরৎ মৎ দেখ না।” এইরূপ বলিতে বলিতে ফরাস যন্ত্রের ঘোড়ার ন্যায় নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। সুরেশচন্দ্রও ধীরে ধীরে বিডন-পার্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক নিভৃত স্থানে আসিয়া বসিলেন।

সুরেশবাবু বড় অর্থের টানাটানিতে পড়িয়াছেন। যে কোন উপায় কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিলে, তাঁহার মান সম্ভ্রম আর থাকে না। কুন্দের প্রেমের ভাড়া, তিনি আর কিছুতেই যোগাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। দুই মাসের ভাড়া পড়িয়াছে। এদিকে কুন্দের মাতা ময়না সুন্দরী, টাকার জন্য একেবারে ফৌজদারী তাগাদা লাগাইয়াছে—সে তাগাদা অতি সহিষ্ণুতার মস্তকেও পদাঘাত করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেয়! আজ সুরেশবাবুর টাকা দিবার কথা আছে। কিন্তু তিনি টাকা পান কোথা? তাঁহার নিজের এক পয়সা রোজকার নাই। পিতার নিকট অর্থের জন্য সুরেশচন্দ্র আর এক বার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু হিমালয়বাবু টাকা তো দেনই নাই, অধিকন্তু দরওয়ান দিয়া তাঁহাকে বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছেন। মাতার নিকট কিছু যে সংগ্রহ করিবেন, সে পথও তাঁহার বন্ধ। মাতার গহনার বাক্সটী না বলিয়া লইয়া আসিয়া উহা ভাঙ্গাইয়া, কুন্দ প্রেম সরোবরে দিনকতক বেশ ছিনিমিনি খেলাইয়াছিলেন। তারপর ছাপাখানাটীও ঐ প্রণালীতে শেষ করিয়াছেন। হরেন্দ্রের নিকট সুরেশবাবু এক হাজার টাকা ধার চাহিয়াছেন। হরেন্দ্র টাকা দেবেন এমন কথা নিশ্চয় করিয়া কিছু বলেন নাই এবং দেবেন না, এমন কথা বলিয়াও তাহাকে নিরুৎসাহ করেন নাই।

সুরেশচন্দ্র অনেকটা হরেন্দ্রের আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু হরেন্দ্রের সাক্ষাৎ মিলিতেছে না। সুরেশবাবু আর ভাবিতে না পারিয়া "দুর হ'গ ছাই" বলিয়া তিনি জামার পকেট হইতে একটী বৃহৎ শিশি বাহির করিলেন। তারপর এক বার চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সঞ্চালন করতঃ শিশিজাত দ্রব্য খানিকটা পান করিয়া লইলেন। আবার সেই অর্থ চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন "তাইতো কি উপায়ে কিছু টাকা সংগ্রহ করি—গাঁটকাটা হ'ব, জুয়া খেলব। কুন্দ! কুন্দ! কি করব, কি ক'রে তোমার টাকা যোগাড় ক'রব, বলে দাও কুন্দ—"হ'য়েচে, হ'য়েচে, দ্রব্যগুণে আমার মাথা খুলে গেছে।" অর্থ উপার্জ্জনের উপায় নিরূপণ হয়েচে। এই বলিয়া সুরেশচন্দ্র আহ্লাদে লাফাইয়া উঠিলেন। তারপর শিশির অবশিষ্ট পানীয় দ্রব্যটুকু উদরস্মাৎ করিয়া বলিলেন —"সুরাদেবী এত গুণ তোমার না থাকিলে সংসারে তোমার এত আদর কি দিনে দিনে বাড়িত? তোমার কৃপায় এক্ষণে আমি দিব্য জ্ঞান পাইয়াছি, আমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ফিরিয়া আসিয়াছে—আমি জীবন বীমার (Life Insurance) দালালী ক'রব। টাকার জন্য আর ভাবিতে হবে না। এইরূপে সহজে অর্থ উপার্জ্জনের উপায় উদ্ভাবন করিয়া, সুরেশচন্দ্র টলিতে টলিতে তথা হইতে কুন্দালয়ে চলিলেন।

আজ কাল দেখা যায় যিনি চাকুরী বাকুরী কিছু যোটাইতে না পারেন, অথবা অর্থাভাবে ব্যবসা বাণিজ্যে স্থান না পান, তিনিই অমনি জীবন বীমার দালাল হইয়া পড়েন। তারপর

বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-সজনের ত্রাস হইয়া পাহারওয়ালার মতন পথে ঘাটে ফিরিতে থাকেন। কাহাকেও দেখিলেই অমনি মক্কেল ভাবিয়া গ্রেপ্তার করেন। এই সকল পাহারওয়ালার হাতে একবার পড়িলে আর সহজে নিস্তার নাই।

সুরেশচন্দ্র টলিতে টলিতে কুন্দালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুন্দ জিজ্ঞাসা করিল "টাকা আনিয়াছ ?"

সুরে। না, দুই এক দিনের মধ্যেই টাকা দিব।

কুন্দ। বেশ, মাকে তাই বলগে।

সুরে। তোমার মার সঙ্গে আমি দেখা কচ্চি না। সে তাগাদার কথা মনে হ'লে আমার পেটের পিলে ধরফড় কত্তে থাকে।

কুন্দ। টাকা হাতে না ক'রে তুমি কোন সাহসে এখানে মাথা গলালে ?

সুরে। আর দুই চারি দিন তোমার মাকে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে বল না। এবারে আমি জীবন বীমার দালালী ক'রচি—ঝাঁকে ঝাঁকে মক্কেল ধরব, লাখে লাখে টাকা রোজকার করব। তোমার মার শ্রাদ্ধে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করব। তুলোট করব, বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করব।

কুন্দ। মাতলামো ক'রনা, বেশি নেশা হ'য়ে থাকে, তো চুপ করে শুয়ে থাক।

সুরে। হরেন্দ্রের আজ এখানে আস্‌বার কথা ছিল, এখন এলো না কেন—সে আমায় এক হাজার টাকা ধার দিবে বলিয়াছে।

কুন্দ। হরেন্দ্রকে এখানে আর আসতে দেবো না।

সুরে। ওকথা ব'লনা কুন্দ! হরেন্দ্র আমার প্রাণের বন্ধু, তাহার কৃপাতেই তোমা হেন ধনে লাভ করিয়াছি।

কুন্দ। প্রাণের বন্ধু যে ওদিকে তোমার একটী সতীন জুটিয়ে দিচ্চে। মাকে কি ব'লেচে জান? মাকে সে ব'লেচে যে সুরেশ যদি টাকা না দিতে পারে, তবে ওকে তাড়িয়ে দাও। সে একজন পয়সাওয়ালা লোকের ছেলে নিয়ে আসবে।

"মাইরি, এই আমি তোমার দুটী পা জড়িয়ে ধরে পড়ে রইলাম, কোন শালা আমায় তাড়ায় দেখি—"এই বলিয়া সুরেশচন্দ্র কুন্দের পা জড়াইয়া ধরিলেন। সুরেশের অবস্থা দেখিয়া বারবিলাসিনীর পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া গেল। বহুকষ্টে পা ছাড়াইয়া লইয়া, কুন্দ সে কক্ষ পরিত্যাগ করিল। সুরেশ-চন্দ্র অধিক নেশা হওয়ায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন





সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০ঃ*ঃ০—

বেলা বারটা বাজে। কুন্দ বিষণ্ণ মনে আপন কক্ষে বসিয়া আছে, এখনও আহার করে নাই। তাহার মাতা ভাত খাইবার জন্য দুইবার ডাকিয়া গিয়াছে। কুন্দ যাচ্চি যাচ্চি বলিয়া বসিয়া আছে। সুরেশচন্দ্র মক্কেল ধরিতে বাহির হইয়াছেন। এমন সময়ে কুন্দের সই কাকাতুয়া বিবি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "সই! আমাকে ডেকেছ কেন?"

কুন্দ। তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে ভাই বড় বিপদে পড়েছি সই।

কাকাতু। কিসের বিপদ, কি হ'য়েচে সই।

কুন্দ। মা সেদিন যা ব'ল্‌ছিলেন শুনেছ তো?

কাকাতু। হাঁ শুনেছি, সে তো ভাল কথাই ব'ল্‌ছিলেন। হাজার টাকা সেলামী দেবে, মাসে তিনশো টাকা ভাড়া দেবে। তুমি একেবারে ফৌজদারী বালাখানার মোড় হইয়া দাঁড়াইয়াছ—খুব জোর কপাল তোমার সই।

কুন্দ। আমার জোর কপালে দরকার নেই, আমি তো সুরেশের সঙ্গে ঘর সংসার পাতিয়ে বেশ আছি।

কাকাতু। বলিস্ কি লো সই, তোর টাকার দরকার নেই। ওলো তোর চোখ ছল ছল ক'চ্চে কেন—ও আমার পোড়া কপাল, তাই বল, মরেছিস্। এঁ্যা, ভালবাস্লি কি ব'লে ছুঁড়ী।

কুন্দ। চুপ কর ভাই, চুপ কর, ওকথা মা শুনতে পেলে, তাকে আর এখানে আসতে দেবে না।

দুই সইতে যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, সেই সময়ে কুন্দের মাতা ময়না সুন্দরী কন্যাকে আহার করিবার জন্য ডাকিতে আসিয়া, দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ইহাদের সকল কথা শুনিয়াছিল। এক্ষণে ময়না ক্রোধে ভীমামূর্ত্তী ধারণ করিয়া, সেই কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ময়নার সে ভীমা মূর্ত্তি দেখিয়া, কুন্দ সে স্থান হইতে পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিল। ময়না বলিল—"মা অনেক্ষণ শুনিতে পাইয়াছে। একাজে আমার পনেরগণ্ডা বয়স হ'লো, চুল পাকলো। দেখ ভালখাগী, এখনও ভাল কথায় ব'ল্‌ছি, যদি ভাল চাস্ তো ভালবাসার বদখেয়াল ছেড়ে দে— নটীকুল কলঙ্কিনী।

কুন্দ। ভদ্রলোককে আমি সুধু সুধু কি ব'লে তাড়িয়ে দেবো?

ময়না। আরে রেখে দে তোর ভদ্রলোক। আমার বাপ মার আশীর্ব্বাদে আমার দিনকালে অনেক ভদ্রলোক দেখেচি। সব ব্যেটা হাড়ি, হাড়ি। ভদ্রলোকে কি কখনও কি কখন মাগ ছেলে ছেড়ে এই আস্তাকুড়ে ঘাঁটতে আসে। ফেল কড়ী মাখ তেল, এই সম্বন্ধ।

কুন্দ। সে ব্যক্তিও তো টাকা দিচ্ছে, না হয় দুমাস দিতে একটু দেরী হ'য়েচে। আমি ভদ্রলোককে সুধু সুধু তাড়াতে পারব না। ঝগড়া মারামারি ছোটলোকমি কত্তে পারব না।

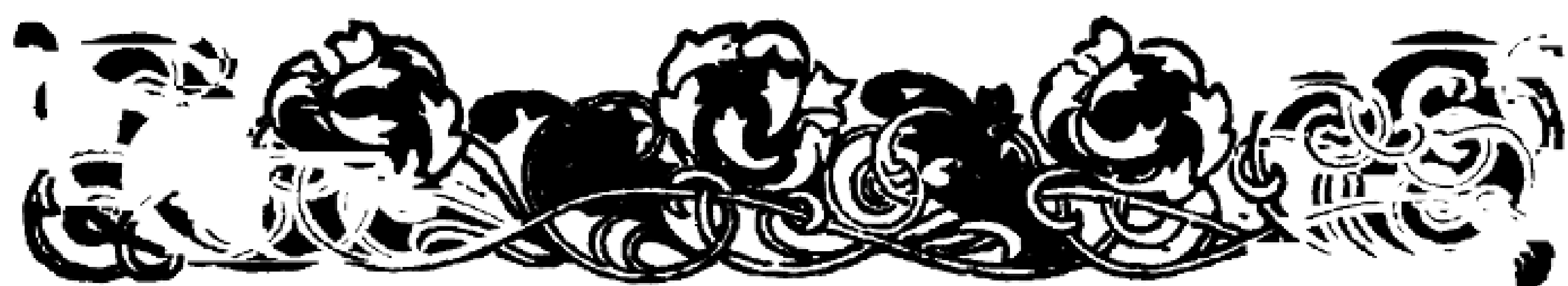
ময়না। বেশ লো বেশ, তোর ভদ্রলোককে ভদ্রলোকের মতনই তাড়ান হবে, তার আর ভাবনা কি।

কুন্দ। যা কত্তে হয় তোমরা করগে, আমায় কিছু ব'লোনা।

ময়না। বেশ তাই হবে, আমরাই তাড়াব। তবে তোকে দুই একটা কথা যা শিখিয়ে দেবো, সেই রকম করবি, বাকি সকল ভার আমার রৈল।

"যা হয় করগে, আমি আফিন খাব, গলায় দড়ি দেবো" এই বলিয়া কুন্দ দ্রুতগতি সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ময়না সুন্দরীও তৎপশ্চাৎ "ফের যদি বেশি কথা কবি, তবে এখনি মুস্কোদের দিয়ে বারাণ্ডায় বেঁধে তোকে বিছুটী লাগাব—হারামজাদী, ভালখাগী, নটীকুলকলঙ্কিনী" বলিতে বলিতে নিম্নতলে আসিল।





অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ



আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সন্ধ্যা হইতে তিন চারি ঘণ্টা খুব ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। রাত্রি একটা বাজে, এখনও মধ্যে মধ্যে দমকা বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ হইতেছে এবং দুই চারি ফোটা বৃষ্টিও পড়িতেছিল, সুরেশচন্দ্র কুন্দের কক্ষে পালঙ্কোপরি নিদ্রা যাইতেছিলেন। হঠাৎ কুন্দ সুরেশ বাবুকে ডাকিতে লাগিল "ওগো ওঠোনা একবার, এমন ঘুম তো কখন দেখিনি—ওরে বাবারে, মারে, রাত বুঝি আর কাটেনারে।" কুন্দের চীৎকারে সুরেশের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি পাশমোড়া দিয়া বলিলেন—"কি হ'য়েছে তোমার, উঠে কি ক'রব?"

"এখনি ডাক্তার ডেকে আন, আমার বড় অসুখ ক'চ্ছে" এই বলিয়া কুন্দ পালঙ্কোপরি কাতরাইতে লাগিল। সুরেশ বাবুর ঘুমের ঘোর তখন ছাড়ে নাই, তিনি বলিলেন "একটু ঘুমাও সব সেরে যাবে।" কুন্দ কাতর স্বরে বলিল—"ঘুমুতে পাল্লে আর তোমার তোষামোদ করি। ওগো শীগ্‌গির যাও একজন ডাক্তার ডেকে আন, আমার পেটের ভেতর কে যেন লড়াই ক'চ্ছে। উঃ গেলুম, মলুম, ওরে বাবারে মারে"। এই বলিয়া কুন্দ পালঙ্কোপরি

ছট ফট করিতে লাগিল। সুরেশচন্দ্র শয্যা ত্যাগ করিতে আলস্য বোধ করিতেছিলেন। তিনি পুনরায় বলিলেন "এই ঝড় বৃষ্টিতে এত রাত্রে কোথায় ডাক্তার ডাকিতে যাই বল দেখি। রাতটা কোন রকমে পেটে হাত দিয়ে কাটিয়ে দাও, সকাল হ'লেই ডাক্তার নিয়ে আস্‌ব।"

"উঃ যন্ত্রণায় আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, আর তোমার এই কথা। আজ আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী হ'লে একথা তুমি ব'লতে পার্ত্তে ?" এই বলিয়া কুন্দ তাহার মাকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল।

"ঘাট হয়েছে আমার, এই আমি ডাক্তার আনিতে চলিলাম, দোহাই তোমার মাকে ডাকিও না। তাঁহাকে দেখিলে আমার বড় অসুখ করে।" এই বলিয়া সুরেশচন্দ্রও শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। কুন্দ বলিল—"বহুবাজারের নিশি ডাক্তারকে আন্‌বে, তিনি আমার হালচাল সব জানেন। এ রকম পেটে ব্যাথা আমার মাঝে মাঝে প্রায় হয়। তাঁর একদাগ ঔষধ খেলেই সব সেরে যায়।" কুন্দের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, সুরেশচন্দ্র সেই রাত্রে ডাক্তার আনিতে বহুবাজার ছুটিলেন।

সুরেশচন্দ্রের প্রস্থানের অনতিবিলম্বে যমদূতের মতন দুইটী লোক আসিয়া কুন্দদের বাটীর সদর দরজায় একটা ছোট বাঁশের সিঁড়ি লাগাইয়া ক্ষিপ্রহস্তে কতকগুলি কাগজের নিশান ও কাগজের মালা টাঙ্গাইয়া দিল। অনন্তর তাহারা একখানি বৃহৎ কাঠের সাইনবোর্ড সদর দরজার উপর ঝুলাইয়া দিল। সাইনবোর্ড খানিতে বড় বড় অক্ষরে

লেখা ছিল, "হিন্দু হোটেল"। নিমিষের মধ্যে এই কার্য্যগুলি সুসম্পন্ন করিয়া, তাহারা তথা হইতে অন্তর্হিত হইল। ইহারা ময়নার পেটোয়া লোক।

এদিকে সুরেশচন্দ্র বহুবাজার তোলপাড় করিয়া ফেলিলেন, তথাপি নিশি ডাক্তারের কোনও সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে অন্য একজন ডাক্তারের বাটীতে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন; কিন্তু ডাক্তার বাবুটী অত রাত্রে বহুবাজার হইতে রামবাগানে আসিতে সম্মত হইলেন না। সুরেশচন্দ্র তাঁর ডবল ভিজিট দিতে চাহিলেন, কিন্তু ডাক্তারবাবু টাকার মায়া পরিত্যাগ করিয়া সুরেশ বাবুকে বিদায় দিলেন। অত রাত্রে অজানা লোকের সহিত বেশ্যা ভবনে যাওয়া, তিনি যুক্তি মনে করিলেন না। সুরেশচন্দ্র অগত্যা হতাশ মনে কুঞ্জালয়ে ফিরিলেন। বাটীর সম্মুখে আসিয়া সুরেশচন্দ্র চমকাইয়া উঠিলেন—"অ্যাঁ, তাইতো রাস্তা ভুল ক'ল্লাম নাকি!" তদনন্তর দুই হাতে চক্ষুমর্দ্দন করতঃ বলিলেন—"ভুল ক'রব কি, এ রাস্তা যে আমার চিরপরিচিত, চোখ বুজে এ রাস্তায় আসি, যাই। বেশি নেশা হ'য়েছে এমন কিছু নয়। সেই কখন দু'চার গেলাস খেয়েছিলাম, নেশাতো দূরের কথা, একটু মাথা টিপ টিপও ক'চ্ছে না। তাইতো এ আবার কি ব্যাপার! এইতো সেই পানের দোকান, এইতো সেই বাড়ী, তবে মাঝে থেকে একটা হিন্দুহোটেল জন্মাল কোথা থেকে। না বাবা বড় ধোঁকায় ফেল্লে দেখছি। যা হোক একবার ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখা যাক।" এই বলিয়া সুরেশচন্দ্র তখন কড়া নাড়িয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন।

কিয়ৎকাল ডাকাডাকির পর ভিতর হইতে একজন স্ত্রীলোক উত্তর দিল "কে ডাকে গা।"

সুরে। আমি গো আমি, দরজাটা খুলে দাও।

ঝি। খাবার দাবার সব ফুরিয়ে গেছে বাপু, ফিরে দেখ্‌তে হবে। বামুন ঠাকুরও বাড়ী চ'লে গেছে।

সুরে। তুমি দরজাটা খুলে দাওনা, আমি ভিতরে যাব।

ঝি। ভিতরে এসে কি ক'রবেন মশাই, খাবার দাবার সব উঠে গেছে। হোটেল ব'লে কি সমস্ত রাত্রি লোক ব'সে থাক্‌বে।

সুরে। কি বিপদ। ওগো আমি টগরের কাছে যাব, আমি যে তার মানুষ।

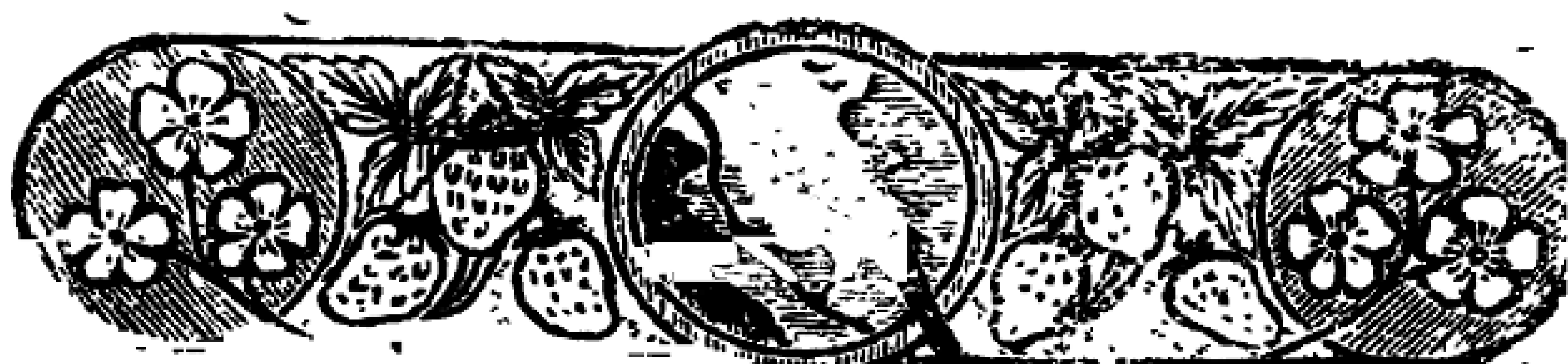
ঝি। এই রে, রাত দুপুরে মাতালের হাতে প'ড়লুম দেখছি। টগর কে রে মিন্সে? এটা হোটেল, খাবার জায়গা, শোবার জায়গা নয়।

সুরেশচন্দ্র অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আপনাপনি বলিতে লাগিলেন—"রাত দুপুরে রাস্তায় বেরিয়ে কি ঝকমারিতেই প'ড়লাম। আমায় কিছুতে পেলে না কি? আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি, পথ ভুল করিনি—এই সেই বাড়ী। একি ভানুমতির খেলে প'ড়লাম বাবা। সুরেশচন্দ্র আবার ডাকিলেন ওগো বাছা! দরজাটা ছাই একবার খুলেই দাওনা।"

"তবেরে মাতাল মিন্সে, ভাল চাস্‌তো এখনি এখান থেকে স'রে পড়্‌, নইলে এই বাল্‌তীর জল তোর গায়ে ঢেলে দেবো" এই বলিয়া ঝি এক বাল্‌তী জল লইয়া বারাণ্ডা হইতে সুরেশের গায় ঢালিয়া দিতে গেল। সুরেশচন্দ্র

"রক্ষা কর ঝি মা ! এই ঝড় বৃষ্টির দিন আর গায় জল দিও না", এই বলিয়া তথা হইতে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত প্রস্থান করিলেন। সুরেশচন্দ্র তথা হইতে প্রস্থান করিলে পরে ময়না ও যমদূতের ন্যায় সেই লোক দুইটা আসিয়া নিশান, মালা এবং সাইন-বোর্ড প্রভৃতি নামাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। কুন্দদের বাড়ী যেমন ছিল তেমনি হইল। হিন্দু হোটেলের কোন চিহ্নও রহিল না। রাত্রি আড়াইটা তিনটার সময়ে সুরেশচন্দ্র কোথায় যান। অবশেষে বিডন গার্ডেনের মধ্যে আসিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন।





ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

এখনও সুর্য্যোদয় হয় নাই। হরেন্দ্র মর্‌নিং ওয়াক্‌ করিতে বাহির হইয়াছেন। হস্তস্থিত ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে হরেন্দ্র বিডন পার্কের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং খুব দ্রুতগতি বাগানের মধ্যে দশ পনের পাক ঘুরিয়া বিশ্রামার্থে একখানি বেঞ্চের উপর উপবেশন করিতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে আর একখানি বেঞ্চের উপর সুরেশচন্দ্র শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। হরেন্দ্র তখন ধাক্কাধাকি করিয়া সুরেশবাবুকে জাগ্রত করিলেন। হরেন্দ্রকে দেখিয়া এবং রাত্রে নিজের দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া প্রথমটা সুরেশচন্দ্র ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর হরেন্দ্রকে রাত্রের ঘটনা সমুদয় বলিলেন। হরেন্দ্র শুনিয়া হো হো শব্দে হাসিয়া বলিলেন—"ভায়া তুমি নেশার ঝোঁকে আর কোন রাস্তায় গিয়া পড়িয়াছিলে। নতুবা একি বিশ্বাসযোগ্য যে, দুই এক ঘণ্টার মধ্যে টগরদের বাড়ীটা হিন্দু হোটেল হ'য়ে গেল।"

সুরে। ভাই তোমায় মিথ্যা বলিয়া আমার লাভ কি।

আর আমার কথায় বিশ্বাস করিবার দরকারই বা কি, এখনি চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন কর না কেন?

"সেই কথাই ভাল" বলিয়া হরেন্দ্র ও সুরেশবাবু বিডন পার্ক হইতে রামবাগানে আসিয়া দেখিলেন, যেমন বাড়ী তেমনি র'য়েচে। তখন হরেন্দ্র সুরেশকে বলিলেন—"ভায়া এমন গল্প আর কাহারও কাছে করিও না।"

"তাইতো হে, এ বাবা ভানুমতির খেল না হ'য়ে যায় না, এই দুই ঘণ্টা আগে দেখে গেলাম হোটেল, আর এখন কোথাও কিছু নাই" এই বলিয়া সুরেশচন্দ্র কড়া নাড়িয়া ডাকিতে লাগিলেন।

ঝাঁটা হস্তে কুন্দের মাতা "কে ডাকে গা" বলিয়া দরজা খুলিয়া দিল এবং সুরেশকে দেখিয়া বলিল—"খবরদার তুমি আর আমার বাড়ীতে পা দিও না।"

সুরে। কেন মা, আমার কি অপরাধ হ'লো।

ময়না। কি অপরাধ, অভদ্র, ছোট লোক।

হরে। কি ব্যাপার শুনিতে পাই না?

ময়না। মশাই, কাল রাত্রে আমার মেয়ের ভয়ানক অসুখ হ'য়েছিল। বাবুকে ডাক্তার ডাক্তে পাঠান হ'লো, আর বাবু কিনা সমস্ত রাত কোথায় ইয়ারকি দিয়ে সকালবেলা এখানে আমাদের কেদাস্ত কত্তে এলেন। মেয়েটা যদি মরে যেতো মশাই!

হরে। তাইতো এ বড় অন্যায় কথা।

সুরে। আমি এসেছিলাম। এসে দেখ্‌লেম তোমরা সব কোথায় গিয়েছ—এক মাগী ঝি বারাণ্ডা থেকে ব'ল্লে, "এটা হোটেল, এখানে টগর নামে কেউ থাকে না।"

ময়না। নেকাপনা ক'র্‌বার আর জায়গা পাওনি। শুনুন মশাই, একবার গুলীখুরী গল্পটা শুনুন। উনি রাত্রে এসেছিলেন—এসেছিলে তো ডাক্তার কৈ, ঔষধ কৈ?

সুরে। অতরাত্রে ডাক্তার এলো না।

ময়না। ডাক্তার এলো না, পয়সার লোভ অমনি ডাক্তার ছেড়ে দিলে—এত বড় ডাক্তারটা কে শুনি।

সুরে। কি বিপদেই প'ড়লাম ভগবান! দোহাই মা, আমি মিথ্যে ব'ল্‌ছিনি, তোমার মেয়ের যৌবনের দিব্যি আমি এসেছিলাম। ঝি মাগী মাতাল ভেবে আমার গায় জল দিতে এলো, আমি পালিয়ে গেলাম।

হরে। যাক্ বুঝেছি ব্যাপার কি! নেশার ঝোঁকে বোধ হয় রাস্তা ঠিক ক'ত্তে না পেরে অন্য কোন রাস্তায় গিয়ে পড়েছিল। তারপর কোন হোটেলের দরজায় গিয়ে ঠেলা-ঠেলি করাতে, তাহারা তাড়িয়ে দিয়েছিল। যাক্ যা হ'বার তা হ'য়ে গেছে, নেশার ঝোঁকে এক কাজ করে ফেলেছে, এবারের মতন মাপ করা হোক। কিছু না হয় জরিমানা ক'রে ছেড়ে দেওয়া হোক।

সুরে। বা, তুমি তো খুব বুঝেছ দেখ্‌ছি।

ময়না। ফের কথা, অভদ্র, ছোট লোক।

সুরে। ঘাট্ হ'য়েছে, এই কান ম'ল্‌ছি।

সুরেশচন্দ্র তাঁহার অপরাধের জন্য কাণ মলিলেন।

ময়না হরেন্দ্রকে বলিল—"আপনি ভদ্রলোক ব'ল্‌ছেন তা আর কি ব'ল্‌ব। আপনার কথা ঠেলিতে পাল্লাম না, এবারের মতন মাপ করিলাম। তবে এই গর্হিত কার্য্যের

জন্য এক হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে, আর এ মাস থেকে তিনশত টাকা করে মাসে দিতে হবে। যদি রাজি থাক, তবে বাড়ীতে মাথা গলিও, না হ'লে এ রাস্তায় আর এসো না।"

সুরে। সর্ব্বনাশ, আমায় বেচিলেও অত টাকা হবে না।

"তাই হবে তাই হবে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর গোলমাল করিয়া কাজ নাই" এই বলিয়া হরেন্দ্র সুরেশের হাত ধরিয়া তথা হইতে টানিয়া লইয়া চলিলেন।

সুরে। বেশ, তুমি তো খুব, তাই তাই দিয়ে এলে, আমি এখন টাকা পাই কোথায়?

হরে। বাড়ী থেকে কিছু নিয়ে এসো।

সুরে। ও বাবা, সে পথ বন্ধ। আমার আর বাড়ী ঢোকবার যো নাই। বাবা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। সেই অবধি আমি এই খানেই র'য়েছি দেখ্‌ছ না।

হরে। তাড়িয়ে দিলেন কেন?

সুরে। কেন তা তিনিই জানেন। আমার অপরাধের মধ্যে—মার গহনার বাক্সটা আনিয়া টগরকে দিয়াছিলাম।

হরে। তাহ'লে এখন কি ক'র্‌বে?

সুরে। কি ক'র্‌ব তা জানি না। কিন্তু টাকা আমার চাই। যেমন ক'রে হোক টাকা সংগ্রহ ক'র্ত্তে হবে। টগর-বিহীন জীবন রাখ্‌ব না।

হরে। এক কাজ ক'র্ত্তে পার যদি, কিছু টাকা আমি তোমায় যোগাড় করিয়া দিতে পারি।

সুরে। এক কাজ কি ব'ল্‌ছ হরেন্দ্র! শত সহস্র কাজ

করিতে প্রস্তুত আছি। গো-হত্যা, ব্রহ্মহত্যা যা ব'লবে তাই করিতে প্রস্তুত আছি। টাকা চাই, টগর চাই।

"হত্যে টত্যে ক'র্ত্তে হবে না, তার চেয়ে সহজ উপায় আছে। উপস্থিত এক কাজ কর, খুব এক গাছা মোটা দেখে কেমিক্যালের চেন, আর গোটাকতক কাচের আংটী সংগ্রহ করে রাখ। তারপর যা যা ক'র্ত্তে হবে আমি সব শিখিয়ে দেব। এখন তবে চল্লেম।" এই বলিয়া হরেন্দ্র তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

হরেন্দ্র প্রস্থান করিলে পর সুরেশচন্দ্র অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই স্থানে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—"টাকা চাই, দুই হাজার টাকা চাই, তবে টগরকে আবার দেখিতে পাইব। টগর, প্রাণের টগর! দুদিন অপেক্ষা কর। যেমন ক'রে পারি টাকা আন্‌ব" এই বলিয়া সুরেশচন্দ্রও তথা হইতে বেগে প্রস্থান করিলেন।





ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

-•⁂*⁂•-

রাত্রি নয়টা বাজিয়াছে। এমন সময়ে হিমালয় বাবু কতকগুলি ফুলের বাস্কেট ও মালা লইয়া হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের অফিসের বড় সাহেবের মেম বিলাত যাইতেছেন, সাহেব মেমকে বম্বে মেল গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়াছেন। হিমালয় বাবু কৃতজ্ঞতা জানাইবার সুযোগ কখন ছাড়িতেন না। তিনি কতকগুলি ফুল ও ফুলের মালা হাতে করিয়া ষ্টেশনে আসিয়াছেন, উহা সাহেবের মেমকে দিয়া ধন্যবাদ কুড়াইবেন এইরূপ ইচ্ছা। মেম একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া বসিয়াছেন, সাহেব প্লাটফরমে (Platform) থাকিয়া গাড়ীর জানালা দিয়া মেমের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। হিমালয়চন্দ্র সেই খানে উপস্থিত হইয়া মেম ও সাহেবকে সেলাম করতঃ ফুলগুলি সাহেবের হাতে দিয়া একটু তফাতে সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। সাহেব ফুলগুলির অনেক সুখ্যাতি করিয়া মেমের হাতে দিলেন এবং ফুল আনার জন্য

হিমালয় বাবুকে ধন্যবাদ দিতেও ভুলিলেন না। অনেকগুলি সুন্দর ফুল পাইয়া মেমও আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া হিমালয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবু এ ফুলগুলি তোমার বাগানে ফুটিয়াছিল বোধ হয়।" এই প্রশ্নে হিমালয় বাবু কিছু বিপদে পড়িলেন। তিনি মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "না মেম-সাহেব এ গুলি আমার বাগানে ফুটে নাই, আমি উহা মিউনিসিপ্যাল মার্কেট হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়াছি।" মেম আর কিছু বলিলেন না।

বম্বে মেল ছাড়িতে তখন আর অধিক বিলম্ব ছিল না, রেলের কর্ম্মচারিগণ এবং আরোহিগণ ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতেছেন। কেহ ডাকিতেছেন—"কুলি, কুলি।" এমন সময় দিব্য পরিচ্ছদধারী দুইটী যুবক হন্‌হন্ করিয়া হিমালয় বাবুর পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেলেন। তন্মধ্যে একজনের ধাক্কা লাগিয়া হিমালয় বাবু হুমড়ী খাইয়া পড়িতেছিলেন। কিন্তু প্লাটফরমের ধারে একজন কুলি দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে ধরিয়া হিমালয় বাবু সামলাইয়া লইয়া ফিরিয়া দেখিলেন যে, তাঁহারই গুণধর পুত্র সুরেশ ও আর এক ব্যক্তি দ্রুতগতি একখানি ইণ্টারক্লাস গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিল। সুরেশ বম্বে মেলে কোথায় যাইতেছে, ইহা হিমালয় বাবুর জানিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু পিতাপুত্রে বাক্যালাপ নাই; সুতরাং কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হইল না। ইহার দুই চারি মিনিট পরেই নিঃশব্দে বম্বে মেল ছাড়িল। এ দিকে মেম তাঁহার কামরার জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া সাহেবের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণের মানসে সাহেবকে একটী ভালবাসার চুম্বন দান করিতে গিয়া

লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পার্শ্বস্থিত দণ্ডায়মান এক দাড়ী বিশিষ্ট মুসলমান কুলির গালে চুম্বন করিলেন। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার কারণ, গাড়ী সেই মুহূর্ত্তে ছাড়িয়াছিল। কুলি বেটা "তোবা তোবা, আল্লা আল্লা, জাত মারা" বলিয়া লাফাইয়া উঠিল।

মেম এইরূপে, এক দাড়ীবিশিষ্ট কুলিকে চুম্বন করিয়া একবার সাহেবের মুখের দিকে তাকাইলেন, তারপর হাহাঃ রবে হাসিতে হাসিতে গাড়ির মধ্যে গড়াইয়া পড়িলেন। সেই কামরায় অপরাপর দুই একজন সাহেব মেম আরোহী ছিলেন, তাঁহারাও এই দৃশ্যে বিকট হাস্য করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে গাড়ী প্ল্যাটফরম ছাড়াইয়া চলিল; কিন্তু মেমের হাসি তখনও থামে না—তিনি হাসিতে হাসিতে গাড়ীর মধ্যে উলট পালট খাইতেছিলেন। মেমের এত হাসির কারণ অপরাপর আরোহীদিগের সমীপে অপ্রতিভ না হইয়া সপ্রতিভ থাকা। নতুবা মুসলমান কুলিকে চুম্বন করিয়া তিনি এমন সুখ অবশ্য কিছুই অনুভব করেন নাই, যাহাতে এত হাসির কারণ থাকিতে পারে। চুম্বনকালে অবশ্যই রসুনের তীব্র গন্ধে তাঁহার নাসারন্ধ্র জ্বালা করিয়া উঠিয়াছিল। সাহেব কিন্তু এই ব্যাপারে মেমের মত হাসিতে পারিলেন না। তিনি কিয়ৎকাল নিস্তব্ধে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অতি ক্ষুন্ন মনে "Unfortunate incident" এই কথাটী অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিয়া আপন গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। হিমালয় তাঁহার অফিসের বাবু এই ঘটনা দেখিয়াছেন বলিয়া, সাহেবের মনে বড় পীড়া উৎপাদন করিতে লাগিল। সেই দিবস সাহেবের সহিস, কোচম্যান, খানসামা প্রভৃতি সকলেই, কেহ

মার খাইল, কেহ গালি খাইল। মেমের দুষ্কর্ম্মের জন্য চাকর বাকরের লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইল। সকলে বলিতে লাগিল মেমের বিরহে সাহেব ক্ষাপা হইয়াছে।





একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন অতি প্রত্যুষে বম্বে মেল গয়া ষ্টেসনে আসিয়া দাঁড়াইল। অনেক লোক গয়ায় নামিলেন, সেই সঙ্গে আমাদের সুরেশচন্দ্র ও হরেন্দ্রও নামিলেন। ষ্টেসনের বাহিরে আসিয়া হরেন্দ্র সুরেশকে বলিলেন "আমি যেমন যেমন শিখাইয়া দিয়াছি, ঠিক মনে আছে তো? এখন সেইরকম ক'র্ত্তে হবে।" ষ্টেসনের বাহিরে খানিকটা খোলা জায়গা পড়িয়া আছে, তাহার মাঝে মাঝে কতকগুলি গাছ পালা আছে। সুরেশচন্দ্র তখন একটী গাছের তলায় মাথায় হাত দিয়া বসিলেন: গয়ালীদের সেতোরা যাত্রী ধরিবার জন্য এইখানে দলে দলে ঘুরিয়া বেড়ায়। সুরেশচন্দ্র ও হরেন্দ্রকে দেখিয়া একজন সেতো আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বাবু সাহেব আপনাদের গয়ালী কে?"

হরে। আমাদের গয়ালী কেহ নাই।

সেতো। তবে আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাদের ভাল গয়ালীর ঘরে নিয়ে যাচ্চি। আপনাদের কাজ হবে তো। না আপনারা বেড়াতে এসেছেন?

হরে। আমরা কাজ ক'ত্তেই এসেছিলাম, কিন্তু আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। আমরা বড় বিপদে পড়িয়াছি।

সেতো। কি হ'য়েছে আপনাদের ?

"বাপু অন্য যায়গায় যাও, আমাদের কাজ কর্ম্ম কিছুই হবে না। নিজের জ্বালায় মর্‌ছি, তার উপর উনি বকাতে এলেন।" এই বলিয়া সুরেশচন্দ্র আপনার কপাল চাপড়াইতে লাগিলেন।

হরেন্দ্র বলিলেন,—"আমাদের দুঃখের কথা শুনিয়া আর কি করিবে বল। আমাদের সব টাকা গাড়িতে চুরি গিয়াছে। একটা গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগে দুই হাজার টাকা ছিল, ব্যাগ সমেত চুরি গিয়াছে। এই বাবুটী ওঁর বাপের প্রেত কার্য্য করিতে আসিয়াছিলেন, উনি খুব একজন বড় লোকের ছেলে, খুব ঘটাকরে কাজ ক'রবেন ব'লে দুই হাজার টাকা সঙ্গে করে এনেছিলেন। আমি ওঁদের বাড়ীর গোমস্তা। ব্যাগটা আমার হাতেই ছিল, সমস্ত রাত্রি ঠিক ছিল, এই সকাল বেলাটা আমার একটু তন্দ্রা এসেছিল, আর তারি মধ্যে কাজ সাবাড় করে গেছে। গয়ায় এসে গাড়ি থাম্‌তেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, কিন্তু ব্যাগ আর দেখ্‌তে পেলেম না। কখন ব্যাগ নিল, কখনই বা গাড়ী থেকে নাম্‌ল, কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লাম না।"

সেতো। তা'হলে আপনারা এখন কি করবেন ?

সুরেশ। আমার মাথা ক'রব, মুণ্ড করব, এখনি কলি-কাতায় গাড়িতে বাড়ী ফিরে যাব।

হরে। তাই বা হ'চ্চে কি ক'রে। টিকিট কিন্‌বার

পয়সা কোথায়। রিটারণ টিকিট দুখানিও যে ব্যাগের মধ্যে ছিল।

সুরেশ। হায় হায়, তুই ব্যাটা আমার সর্ব্বনাশ ক'ল্লি। যা এখনি এই একটা আংটি দশ পনের টাকায় বেচে নিয়ে আয়, এ হীরের আংটী দশ পনের টাকায় পেলে সকলেই নেবে।

হরেন্দ্রের গল্প সেতো একেবারে অবিশ্বাস করিতে পারিল না। সে দেখিল সুরেশের পরিধানে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ। হাতে চারি পাঁচটা হীরকাঙ্গুলী ঝক ঝক করিতেছে। মোটা রকম সোণার ঘড়ি, ঘড়ির চেন বুকে ঝুলিতেছে, পিরাণে সোণার বোতাম লাগান। দেখিলে বেশ বড় লোকের ছেলে বলিয়াই বোধ হয়। সুতরাং সেতো ভাবিল হইতে পারে, সত্যই ইহাদের টাকা চুরি গিয়াছে। গাড়ীতে এরূপ চুরির কথা কিছু নূতন নহে। সেতো বলিল "আপনারা এক কাজ করুন, আমার সঙ্গে গয়ালীর বাড়ীতে চলুন। তিনিও পয়সাওয়ালা লোক, বিশেষতঃ আপনারা যখন যাত্রী, বাপ মার কার্য্য করিতে আসিয়াছেন, তখন তাঁহার দ্বারা আপনাদের কোন না কোনরূপ উপায় হইতে পারে।"

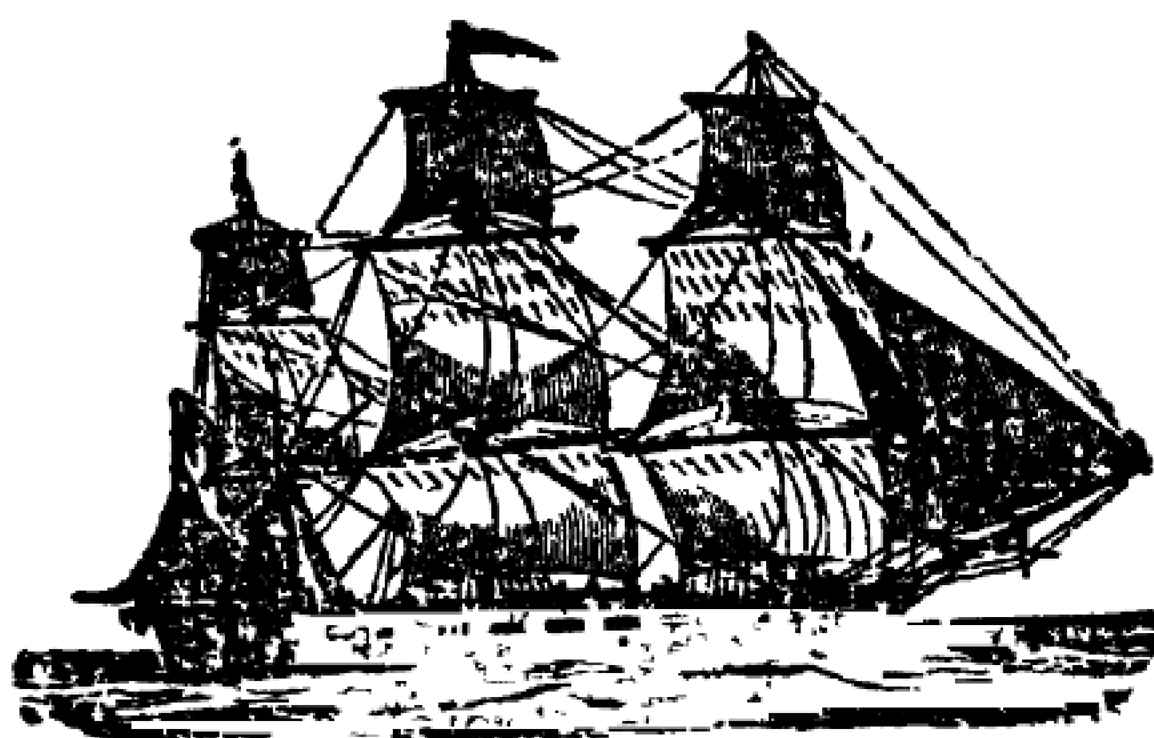
হরে। চলুন সুরেশবাবু! তাই চলুন। এ ব্যক্তি মন্দ পরামর্শ বলে নাই।

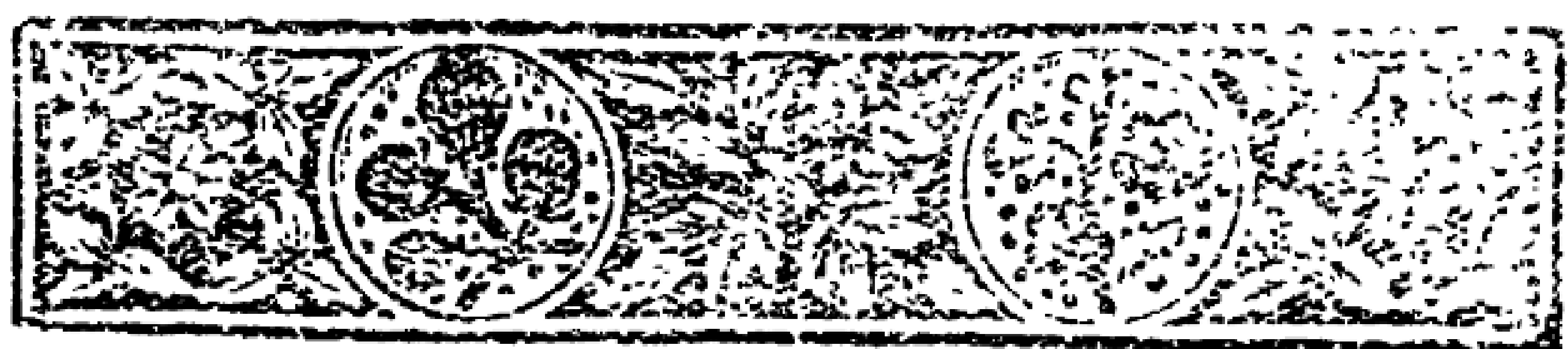
সুরে। আমার কোথাও যাবার ইচ্ছা নাই, আমার ম'র্ত্তে ইচ্ছা হচ্ছে।

সেতো। বাবু যা হ'য়ে গেছে, তার তো আর উপায় নাই। আপনারা সারা রাত্রি গাড়িতে এসেছেন. এখন

আপনাদের একটু বিশ্রাম দরকার, তারপর একটু খাওয়া দাওয়ারও যোগাড় ক'র্ত্তে হবে।

এইরূপ বাদানুবাদ ও যুক্তিপূর্ণ তর্কের পর সুরেশচন্দ্র গয়ালীর বাড়ী যাইতে সম্মত হইলেন। সেতো একখানি একাগাড়ি ভাড়া করিয়া আনিল, তাঁহারা সকলে তাহাতে উঠিয়া বসিলেন।





দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

--০:*:০--

যাহাদের পা পূজা না করিলে আমাদের বাপ মার উদ্ধার হয় না, যাহারা সুফল না দিলে আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হয় না, তাহাদের বিষয় কিছু কিছু জানা আবশ্যক।—লাল্লু ভেঁইয়া গয়ার মধ্যে একজন ধনাঢ্য গয়ালী। বয়ক্রম পঞ্চাশ বৎসরের উপর হইবে। চুলগুলিতে বেশ পাক ধরিয়াছে, তথাপি সর্ব্বদা সে গুলিতে বিশেষ যত্ন দেখা যায়। মা দুর্গার চোরার ন্যায় গোফ জোড়াটী সর্ব্বদা পাকাইয়া উর্দ্ধ মুখী করিয়া রাখিয়াছেন। সকালে বৈকালে দুইবেলা ক্ষৌর কার্য্য করা হয়। তিনিই এক্ষণে এই ভেঁইয়া বংশের কর্ত্তা। কর্ত্তার দুই পুত্র, জেষ্ঠ্যের নাম চুনিবাবু, বয়স সাতাস বৎসর হইবে। কনিষ্ঠের নাম পান্না বাবু, বয়স উনিশ বৎসর। ছেলে দুইটী দেখিতে ঠিক রাজপুত্রের ন্যায়। ইহারা কর্ত্তার প্রথম পক্ষের ছেলে। তিনি আবার দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং সেই স্ত্রীর গর্ভজাত একটী পঞ্চম বর্ষীর পুত্র ছিল। সেটী কাল ও অত্যন্ত কুৎসিত হইলেও কর্ত্তার বড় আদরের। তিনি দিবারাত্র সেইটিকে কাছে করিয়া বসিয়া থাকেন, কিন্তু সেই বালকের চাকর, দিবা

রাত্র তাহার কাছে কাছে হাজির থাকে। গয়ালীদের জীবনযাপন ও দৈনিক কার্য্য শুনিতে বোধ হয় পাঠকের বিশেষ শ্রদ্ধা হইবে না। কর্ত্তার পুত্র দুইটী রাজ-পুত্রের মত দেখিতে বটে, কিন্তু একেবারে হস্তি-মূর্খ। কোনরূপ লেখাপড় শেখে নাই। সে বিষয়ে কেহ কোন প্রশ্ন করিলে বলে,—"কেয়া দরকার।"

কর্ত্তা সকালে স্নান করিয়া চেলী অথবা পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া একবার গদাধরের শ্রীমন্দিরে যাইয়া থাকেন। সেখানে যাহার যা প্রাপ্য, তাহা ভাগ বখরা হইয়া গেলে বাটী ফিরিয়া আসেন। অধিকাংশ দিনই নিমন্ত্রণ খান, হয় যাত্রীর বাড়ী না হয় ঠাকুর বাড়ী কোথাও না কোথাও নিমন্ত্রণ থাকে। পরে চব্যচুষ্য সমাধা করিয়া একটী বিরাশী ওজনের নিদ্রা দেন। বেলা পাঁচটা বাজিলে পর তাঁহাদের খানসামারা আসিয়া সেই নিদ্রিতাবস্থায় গা হাত পা টিপিতে থাকে। এইরূপে প্রায় একঘণ্টা কাল টিপিতে থাকিলে, বেলা ছয়টা নাগাত বাবুরা গাত্রোত্থান করিয়া বসেন। বসিবা মাত্র অমনি চাকর মুখে আলবোলার নল ধরে। তামাক টানিয়া পায়খানা সারিয়া আসেন, তারপর স্নান করেন। এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করাইতে অনেকগুলি চাকর, খানসামা নিযুক্ত আছে। জল তোলা, স্নান করাইয়া দেওয়া, ঝাঁট দেওয়া, আলো প্রস্তুত করা প্রভৃতি কার্য্যে তিন চারিটী লোক নিযুক্ত আছে। ছেলেদের কুস্তি লড়াইবার জন্য একজন পালওয়ান নিযুক্ত আছে, কর্ত্তাকে এবং ছেলেদের আনন্দ দিবার জন্য একজন মাহিনা করা ভাঁড় আছে।

তারপরে সিদ্ধি ঘুটিবার জন্য একজন স্বতন্ত্র লোক আছে। স্নান করিয়া উঠিয়া বাবুরা সিদ্ধির সরবত খাইয়া কুস্তি লড়িতে যান। এ সকল কার্য্য বহির্ব্বাটীতে হয়। কুস্তির পর ঠাণ্ডা হইয়া কাদা মাটি মুছিয়া ফেলিয়া দিব্য পরিচ্ছদ ধারণ করেন। সে বেশভূষার আর বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করি না।

গয়ালীদের বড় বুল্ বুল্ পাখী পোষার সখ দেখিতে পাওয়া যায়। ছেলে বুড়া সকলের হাতেই একটী করিয়া পাখী সর্ব্বক্ষণ আছে। রাত্রি সাতটা আটটার পর বেশ ভূষা করিয়া সকলে এক একটী পাখী হাতে করিয়া হাওয়া খাইতে বাহির হয়েন। পথে চলিতেছেন আর পাখীকে বলিতেছেন, "বোল্ তিতো-ভিতো।" এই বুলি যে পাখী বলিতে পারে তাহার মূল্য অত্যন্ত অধিক হয়। এমন কি সময়ে সময়ে ঐ সকল পাখী একটী একশত টাকায় বিক্রয় হয়। আমাদের ভেঁইয়া বাবু ঐরূপ একটী পাখী পঞ্চান্ন টাকায় ক্রয় করিয়াছেন। বায়ু সেবনের পর বাবুরা আসিয়া বৈঠক-খানায় গান বাজনার আসর করিয়া বসেন। ভেঁইয়ার বৈঠকখানাটী বৃহৎ এবং উত্তমরূপে সুসজ্জিত। বেলোয়ারী ঝাড় লণ্ঠন, বৃহৎ আয়না সকল, টেবিল, চেয়ার এবং মূল্যবান ফ্রেমে আঁটা নানারূপ ছবি সকল সেখানে শোভিত রহিয়াছে। রাত্রি একটা পর্য্যন্ত প্রত্যহ গান বাজনা চলে। তারপর বাবুরা বিশ্রামার্থে শয়নাগারে যান। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই লম্পট স্বভাব। এই রূপে ইহারা জীবন যাপন করেন। অর্থের অভাব হয় না, সহৃদয় যাত্রী-বর্গ ইহাদের ভরণ পোষণের ভার লইয়াছেন, অথবা উহারাই

তাহাদের ভরণ পোষণের ভার, আমাদের উপর এমন আইন বাঁধিয়া চাপাইয়া দিয়াছে, যাহা আমরা উপেক্ষা করিতে সাহসী হই না। পৃথিবীর মধ্যে দেখা যায় সকল জাতই তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য এক একটা স্বাধীন রাস্তা রাখিয়া গিয়াছে। কেবল এই হতভাগ্য কাঙ্গালী বাঙ্গালীরাই চাকুরিই তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উত্তম পন্থা বলিয়া পছন্দ করিয়া লইয়াছে।

প্রাতঃকালে গয়ালী ভেঁইয়া বৈঠকখানায় বসিয়া সটকায় তামাক খাইতেছেন। গয়ার যাহা উৎকৃষ্ট অম্বুরী তামাকি তিনি তাহাই খাইয়া থাকেন। বাম হস্তে একটী বুল্ বুল্ আছে, মাঝে মাঝে তাহাকে "তিতো-তিতো" বলাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। এমন সময়ে তাঁহার সেতো আমাদের সুরেশচন্দ্র ও হেরেন্দ্রকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। দিব্য মোটা সোণার চেনধারী জমকাল শিকার দেখিয়া ভেঁইয়া মনে মনে আনন্দ অনুভব করিলেন। "আইয়ে বাবু, বৈঠিয়ে বাবু" বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। সুরেশ ও হরেন্দ্র বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। সাধারণ যাত্রীদিগকে এখানে বসিতে দেওয়া হয় না। তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান আছে। সে সকল স্থান বহু কালের পুরাতন বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সেখানে দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত পর্য্যন্ত পেট হইতে বাহির হইয়া পড়ে। সাধারণ যাত্রীদিগকে থাকিবার জন্য সেই সকল জায়গা দেখাইয়া দেওয়া হয়। পরে গয়ালী ভেঁইয়া সেতোর নিকট সমুদয় ঘটনা অবগত হইয়া সুরেশচন্দ্রের নিকটে আসিয়া বসিলেন।

এবং কিরূপে টাকা চুরি গেল, সে বিষয়ে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সুরেশচন্দ্রও তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। সমুদয় ঘটনা শুনিয়া গয়ালী মহাশয় অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তাহ'লে এক্ষণে আপনারা কি ক'রবেন ?" সুরেশচন্দ্র একটু হতাশ ভাবে বলিলেন, "একটু বিশ্রাম করিয়া রাত্রের গাড়ীতে বাড়ী চলিয়া যাইব মনে করিতেছি। আপনাকে একটু উপকার ক'র্ত্তে হবে মহাশয়! আমরা গ্রহের ফেরে একেবারে কপর্দ্দকহীন হইয়া পাড়িয়াছি। এমন কি আমাদের টিকিট দুখানি পর্য্যন্ত চুরি গিয়াছে। আপনি এই হীরক অঙ্গুরীটি রাখিয়া আমাদের কুড়িটী টাকা যদি দেন, তবে আমরা বাড়ী যাইতে পারিব।" এই বলিয়া সুরেশচন্দ্র অঙ্গুলী হইতে একটী হীরক অঙ্গুরী খুলিয়া পাণ্ডার হাতে দিলেন। সুরেশের হাতে যতগুলি অঙ্গুরী ছিল সে গুলি সব কাচের। তন্মধ্যে একটী আসল অঙ্গুরী ছিল, উহা হরেন্দ্র সুরেশকে পরিতে দিয়াছিল। সুরেশ এক্ষণে সেই অঙ্গুরীটী লইয়া পাণ্ডা মহাশয়ের হাতে দিল। ৺ভঁইয়া অঙ্গুরিটী লইয়া একবার বেশ করিয়া দেখিয়া লইলেন তারপর বলিলেন, "তাই তো মশাই আপনারা তো বড়ই বিপদে পড়েছেন দেখ্‌চি।"

হরে। সকলই গ্রহের ফের মশাই। কোথায় দুই হাজার টাকা খরচ করিয়া জাঁক জমক করিয়া উনি বাপের শ্রাদ্ধ করিতে আসিলেন, দানধ্যান করিবেন, এই সকল সঙ্কল্প ছিল, আর কোথায় এখন ভিখিরির মতন ফিরে যেতে হ'চ্ছে। একেই বলে দৈব দুর্ব্বিপাক।

গয়ালী। আপ্ লোক্‌কা মোকাম কাঁহা ?

সুরে। কোন্নগর, হুগলী জেলা।

গয়ালী। কোন্নগর! কোন্নগর্‌সে দুই তিন বরষ আগাড়ী এক বাবু হামারা গরীবখানামে আয়া থা, ওলোক খুব বড়া আদমি থা, আব্‌কা ঠাকুরকা কেয়া নাম ?

সুরে। ৺হিমালয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

গয়ালী। কেয়া নাম বোলা, কেয়া নাম ?

সুরে। হিমালয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

"হাঁ হাঁ ঠিক, ঠিক, ঐ নাম হায়" এই বলিয়া ভেঁইয়া তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চুণি বাবুকে ডাকিয়া যাত্রীর খাতা আনিতে বলিলেন। চুণিবাবু খাতা আনিয়া দিলে ভেঁইয়া পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ পাতা উল্টাইবার পরই হিমালয়বাবুর নাম বাহির হইল। সেখানে লেখা রহিয়াছে, "শ্রীহিমালয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সাং কোন্নগর, জেলা হুগলী।"

ভেঁইয়া তখন সুরেশচন্দ্রকে বলিলেন, "বাবু আপ্ তো হামারাই ঘর হ্যায়। আপ্‌কো পিতাভি ঘটা করকেঁ উন্‌কা মাকো শ্রাধ্ কর্ গিয়া, আপ্‌ভি উন্‌কা কাম ঘটাসে করেঙ্গে, রূপেয়া দুশ্‌মন লিয়া তো কেয়া ডর হায়। হাম আপ্‌কো রূপেয়া দেঙ্গে।"

সুরে। না গয়ালিজী, আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে, কিছু ভাল লাগচে না। এখন বাড়ী ফিরে যেতে পারলে হয়।

গয়ালী। কাহে ঘড়বাড়াতা বাবু! এভি আপ্‌কা মোকাম.

হ্যায়। হামারি রূপেয়া ভি আপ্‌কা হ্যায়। কুছ ডর নেহি বাবু। হাম সব বন্দোবস্ত্ করদেঙ্গে।

তখন হরেন্দ্র সুরেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "গয়ালিজী যা বল্‌চেন—মন্দকথা নয়। কাজ না সেরে বাড়ী গিয়ে লাভ কি। আবার তো সেই আস্‌তে হবে। যা হবার তা হয়েচে, বেশির ভাগ এই আবার যাতায়াতের কষ্ট ভোগ।"

গয়ালী ঠাকুরের সহৃদয়তা এবং হরেন্দ্রের পরামর্শে-সুরেশচন্দ্র অবশেষে পাণ্ডার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। গয়ালী ঠাকুর সুরেশবাবুর অঙ্গুরিটী প্রত্যার্পণ করত জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবুসাহেব! আপকো কেত্তা রূপেয়া খরচ করনা।" সুরেশবাবু বলিলেন "দুই হাজার টাকা খরচ করিবার ইচ্ছা ছিল। এখন মনে করিতেছি, হাজার টাকার মধ্যে যা হয় তাহাই করিব।"

"কাহে কম্‌তি করেগা বাবুসাহেব! হাম্ আপ্‌কো দোহাজার দেদেঙ্গে।" এই বলিয়া গয়ালী ঠাকুর তখন সেতোকে একজন পুরোহিত ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। পুরোহিত আসিলে গয়ালিজী তাঁহাকে সমস্ত বলিয়া কহিয়া দিলেন এবং সেতোর হাতে পঞ্চাশটী টাকা দিয়া বলিলেন "বাবুর সঙ্গে যাও। শ্রাদ্ধ করিতে যে সকল জিনিষ পত্র ক্রয় করিতে হইবে, ঐ টাকা হইতে করিবে। এবং কাঙ্গালী-দেরও কিছু কিছু দিবে।" অনন্তর সুরেশচন্দ্র পুরোহিতের সহিত ফল্গুনদী তীরে উপস্থিত হইলেন। সেতো নববস্ত্র, উত্তরীয় প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া পশ্চাৎ আসিল। সুরেশচন্দ্র ফল্গুনদীতে স্নান করিয়া নববস্ত্র

পরিধানপূর্ব্বক তাঁহার জীবন্ত পিতা হিমালয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রেত-কার্য্য করিতে বসিলেন। যথারীতি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সুরেশচন্দ্র সেই ফল্গুনদীর তীরে হিমালয়চন্দ্রের উদ্দেশে বালীর পিণ্ডদান করিলেন। নদীতীরে পিণ্ডদান সমাপ্ত হইলে সুরেশচন্দ্র পথিমধ্যে কাঙ্গালীদের পয়সা বিতরণ করিতে করিতে গদাধরের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় গদাধরের পাদপদ্মে সুরেশচন্দ্র পুনরায় তাঁহার জীবন্ত পিতার উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলেন—সুরেশচন্দ্রের হাত কাঁপিতেছিল, পিণ্ড ঘেরার মধ্যে গদাধরের পাদপদ্মে না পড়িয়া ঘেরার বাহিরে পড়িল।

ধন্য রূপসী, ধন্য রূপচাঁদ। এই পরিদৃশ্যমান বিশাল জগতে তোমাদেরই সৃষ্টি সার্থক, তোমাদেরই শক্তি কেবল সীমাহীন। তোমাদের জন্য মানুষ কোন্ কার্য্য না করিতে পারে ইহাই আমরা কেবল দেখিতে চাহি। তোমাদের জন্য মনুষ্য মধ্যে সকলি সম্ভব। শুনিতে পাই মনুষ্য বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কৌশল—তাই অতি বড় নিকৃষ্ট কার্য্য সকল কেবল মাত্র মনুষ্য দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ দ্বারা এরূপ কোন বীভৎস কার্য্য সম্পন্ন হয় না, কারণ তাহারা জ্ঞানহীন, অবোধ। মনুষ্য জ্ঞানবান্, মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহারা আরও শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহাদের কার্য্য আরও নিকৃষ্ট—জগৎ সংসার তাহার সাক্ষ্য, সমগ্র শিক্ষিত সভ্য জগৎ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। হরে বাগদী বড় জোর লাঠী মেরে দুটো লোকের মাথা ফাটিয়ে দেয়, না হয় রাত্রে গৃহ

সিঁদ দেয়। নিকৃষ্ট কার্য্যে বা পাপ কার্য্যে ইহার অধিক—তাহার মাথা খেলে না।

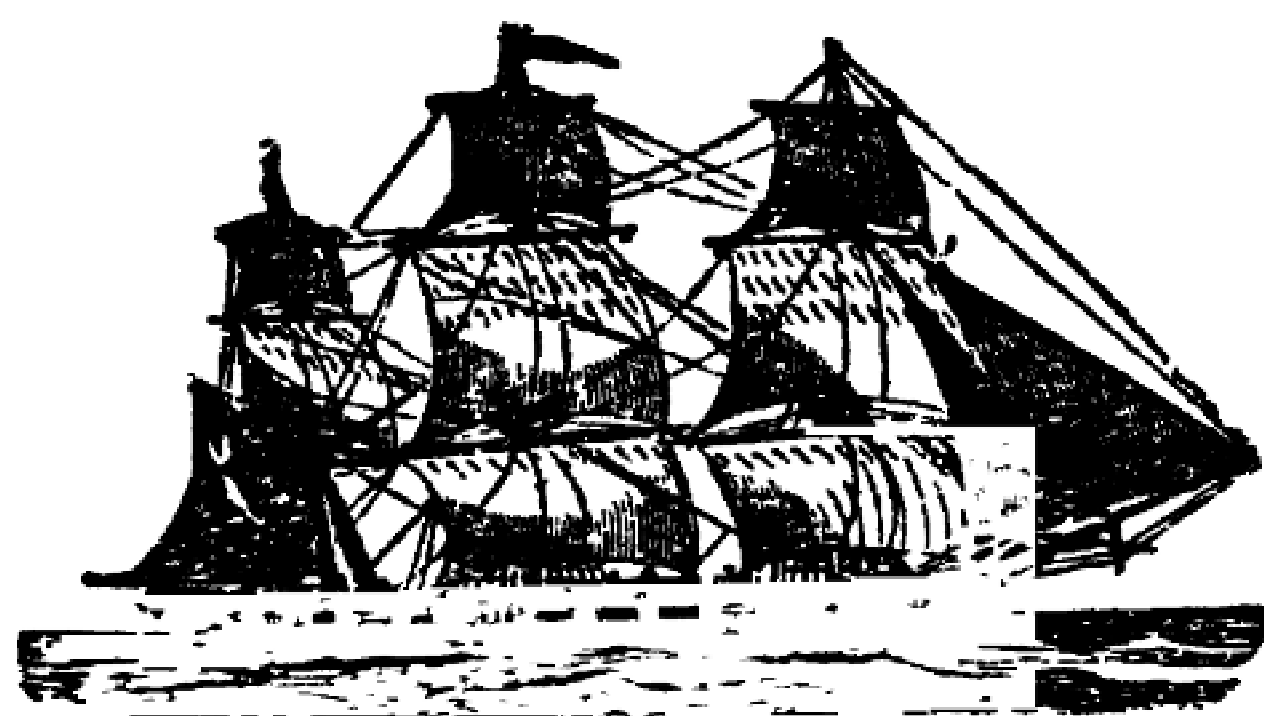
এইবার গয়ালী ঠাকুরের পা পূজা পর্ব্ব। গদাধরের মন্দির হইতে সুরেশচন্দ্র প্রত্যাগমন করতঃ গয়ালীর পা পূজা করিতে বসিলেন। সুফল দেবার সময়ে ভেঁইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কত মূল্য দিবেন?" সুরেশবাবু বলিলেন "দশ টাকা দিব।" গয়ালী হাঁসিয়া বলিলেন—"কেয়া বাবু কেয়া বল্‌তেহেঁ। একশো রূপেয়াকো এক কৌড়ী কমতি নেহি লেঙ্গে। দোহাজার রূপেয়াকো শ্রাধ্‌ হায়, আর হামারা দশ রূপেয়া।" সুরেশচন্দ্র আরও কিছু বাড়িলেন কিন্তু গয়ালী ঠাকুর তাহাতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে সুফলের জন্য সুরেশবাবুকে একশত টাকাই দিতে হইল। পা পূজা হইয়া গেলে গয়ালী ঠাকুর তখন যাত্রীর খাতা এবং ক্যাসবাক্স লইয়া বসিলেন। প্রথমে তিনি সুরেশ বাবুর নাম ধাম প্রভৃতি লিখিয়া লইলেন। পরে সুফলের জন্য একশত টাকা এবং শ্রাদ্ধের খরচ বাবদ ও অপরাপর খরচের জন্য আরও একশত টাকা কাটিয়া লইয়া সুরেশচন্দ্রকে আঠার শত টাকা দিলেন এবং দুইহাজার টাকার এক খত তাঁহার নিকট হইতে লিখাইয়া লইলেন। তদনন্তর গয়ালী ঠাকুর সুরেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কিরূপে উক্ত টাকা গয়াধামে ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। সুরেশচন্দ্র বলিলেন "তিনি পুরি, মিঠাই প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া কাঙ্গালী এবং গয়ালী ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবেন এবং কাঙ্গালীদের একখানি করিয়া বস্ত্র ও চারি পয়সা

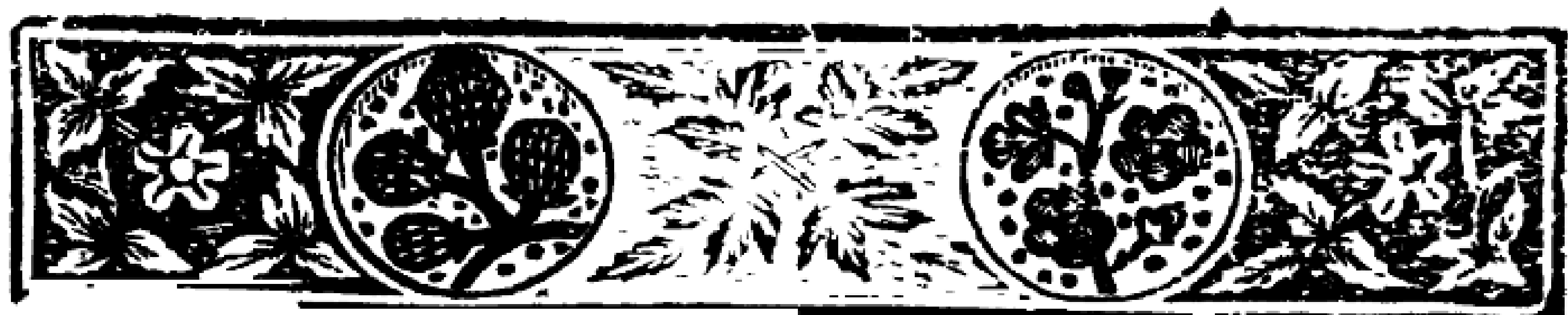
করিয়া নগদ দিয়া বিদায় করিবেন।" সুরেশ বাবুর প্রস্তাব শুনিয়া গয়ালী ঠাকুর খুব সন্তুষ্ট হইলেন। সুরেশবাবু জিনিস পত্রের বায়না স্বরূপ গয়ালীর হাতে কুড়িটী টাকা দিলেন এবং বলিলেন যে তিনি বৈকাল বেলায় কাপড় কিনিয়া এবং পয়সা ভাঙ্গাইয়া আনিবেন। সুরেশবাবুর মহৎ অন্তঃকরণ দেখিয়া গয়ালী খুব ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন এবং তৎক্ষণাৎ লোকজন ডাকাইয়া জিনিসপত্র তৈয়ারী করিতে কিছু কিছু বায়না দিলেন এবং সেতোকে পাঁচশত কাঙ্গালী বলিতে আদেশ দিয়া কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন।

অপরাহ্ণে সুরেশচন্দ্র হরেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া কাঙ্গালীদের জন্য কাপড় ক্রয় করিতে বাজারে গেলেন—আজও গেলেন, কালও গেলেন। রাত্রে গয়ালীরা গান বাজনা প্রভৃতি আনন্দ লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং রাত্রে তাঁহাদের আর কোন খোঁজ হইল না। পরদিন প্রাতে গয়ালী ঠাকুর তাঁহার পুত্র চুণিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবুলোক কাঁহা?" চুণিবাবু বলিলেন "টাট্টি গিয়া হোগা।" ক্রমে বেলা অধিক হইল, সূর্য্যদেবের প্রচণ্ড উত্তাপে গয়ার পাথর সকল তাতিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে আমাদের গয়ালীঠাকুরও তাতিয়া উঠিলেন—"বাবু কাঁহা, বাবুলোক কাঁহা।" ক্রমে সকলের মুখেই ঐ এক কথা "বাবুলোক কাঁহা।" এদিকে দেখিতে দেখিতে ভারে ভারে মিষ্টান্ন, পুরি, প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী গয়ালীর বাড়ীতে আসিতে লাগিল। দলে দলে কাঙ্গালী আসিয়া জমিতে লাগিল। ভেঁইয়াজী উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিতেছেন "বাবুলোক কাঁহা" এবং লাঠী

লইয়া মিষ্টান্নবাহী ভারীদিগকে প্রহার করিতে যাইতেছেন। ভেঁইয়ার বাটীতে হৈ হৈ ব্যাপার রৈ রৈ কাণ্ড পড়িয়া গিয়াছে। ক্রমে গয়া সহরে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সকলের মুখে শুনা গেল "শালা সাচ্চা জুয়াচোর।" গয়ার পুলিশে রিপোর্ট লেখান হইল।

গয়ায় যখন এই সকল ব্যাপার হইতেছিল, তখন সুরেশচন্দ্র কলিকাতায় তাঁহার স্বোপার্জ্জিত অর্থ কুন্দের হস্তে দিয়া বলিতেছিলেন "কুন্দ! এই নাও টাকা আনিয়াছি—তোমার মাকে দাওগে। কিন্তু আমাকে আর সে রকম বিভীষিকা দেখাইও না।"





পরিশিষ্ট ।

—০:*:০ —

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে এক দিবস লালু ভেঁইয়া সুরেশচন্দ্রের সন্ধানে কোন্নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া তিনি জানিলেন যে, হিমালয় বাবু এক্ষণে কলিকাতায় বাসা করিয়া আছেন। ঐ দিবস সন্ধ্যার কিছু পরেই ভেঁইয়া হিমালয় বাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হিমালয় বাবু ভেঁইয়াকে চিনিতে পারিয়া "আইয়ে বৈঠিয়ে" বলিয়া আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। ভেঁইয়া কিন্তু সহসা ভিতরে আসিতে বা বসিতে সঙ্কুচিত হইতেছিলেন। হিমালয় বাবুকে সশরীরে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে দেখিয়া, তিনি প্রথমটা শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। হিমালয়বাবু ভেঁইয়াকে পুনরায় ভিতরে আসিয়া বসিতে বলিলেন। ভেঁইয়া ভিতরে আসিয়া বসিলেন। তদনন্তর পরস্পরের মঙ্গল সমাচার লইয়া ভেঁইয়া হিমালয় বাবুকে তাঁহার পুত্র সুরেশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাতাভিলাষ জানাইলেন। হিমালয় বাবু বলিলেন "সে এখানে থাকে না, তাহাকে গৃহবহিস্কৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার সহিত আপনার কি প্রয়োজন শুনিতে পাই না কি?"

ভেঁইয়া তখন তাঁহার গুণধর পুত্রের কীর্ত্তি বিস্তারে বলিতে

লাগিলেন। হিমালয় বাবু মৃতের ন্যায় নিস্পন্দ ও নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার হাত পা অবশ হইয়া আসিতে লাগিল, তিনি আপনাকে অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই ভাবে কাটিয়া গেলে ভেঁইয়া বলিলেন "মহাশয় আমার টাকার কি হইবে। আমার টাকাগুলি আপনাকে দয়া করিয়া দিতে হইবে।"

হিমালয় বাবু বলিলেন "আমি এক পয়সাও দিব না। আপনি যাহাকে টাকা দিয়াছেন, তাহার নিকট হইতে আদায় করুন।" তখন টাকা লইয়া গয়ালীর সহিত হিমালয় বাবুর অত্যন্ত বাক্‌-বিতণ্ডা চলিতে লাগিল। ক্রমে উভয়েই ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া চীৎকার করিয়া বাক্য বরিষণ করিতে লাগিলেন। হিমালয় বাবু ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ভেঁইয়াকে জুতা লইয়া মারিতে উদ্যত হইলেন। ভেঁইয়া গালি বর্ষণ করিতে করিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন এবং নালিস করিয়া খরচা সহ টাকা আদায় করিবেন বলিয়া শাসাইয়া গেলেন।

অনন্তর ভেঁইয়া উচ্চ আদালতে হিমালয় বাবু ও সুরেশ-চন্দ্রের নামে নালিশ রুজু করিলেন। সন্ধান দ্বারা তিনি সুরেশের আবাস-স্থান বাহির করিয়া তাহাকে সমন ধরাইলেন। হিমালয় বাবুকেও সমন দেওয়া হইল। কুন্দের মাতা ও কুন্দ ভেঁইয়ার নিকটে সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। পরে ময়না ঝাঁটা লইয়া সুরেশের প্রতি ধাবমান হইলেন, সুরেশচন্দ্র জানালা হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিলেন। সেই দিবস হইতে সুরেশচন্দ্রকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। তিনি ফেরার হইয়া বিজনে দিনযাপন

করিতে লাগিলেন। মামলা খুব চলিতে লাগিল। মামলার বিবরণ শুনিয়া জজ, বারিষ্টার, এ্যাটর্নি প্রভৃতি সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

কলিকাতার উচ্চ আদালতে এই প্রকারের মামলা এই প্রথম রুজু হইয়াছে। বারিষ্টারগণ ভাবিয়া আকুল হইলেন, কিরূপ বক্তৃতা করিবেন। জজসাহেব চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন—কিরূপ রায় দিবেন। অনেক দিন ধরিয়া মামলা চলিতে লাগিল এবং শুনিবার জন্য নূতন দিন পড়িতে লাগিল। এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

উক্ত মামলার শুনানির দিন আদালতে অত্যন্ত জনতা হইত। মামলা চালাইতে চালাইতে ভেঁইয়া ও হিমালয় বাবু সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিলেন। এক দিবস ভেঁইয়া তাঁহার কাউন্সিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মামলা নিষ্পত্তি হইতে আর কতদিন লাগিবে। দুই হাজার টাকার মামলায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হইয়া গেল।" কাউন্সিল বলিলেন,—"কোন চিন্তা নাই, খরচা সহ সমুদয় টাকা আদায় হইবে। আর এক মাসের মধ্যেই মকর্দ্দামা শেষ হইয়া যাইবে।" ওদিকে হিমালয় বাবুর কাউন্সিলও তাঁহাকে ঐ প্রকার প্রবোধ দিতেছেন। তিনিও বলিতেছেন "আপনি সমুদয় খরচা পাইবেন, কোন চিন্তা নাই, আপনার জয় হইয়া গিয়াছে।" ক্রমে আরও এক মাস, দুই মাস, তিন মাস চলিয়া গেল তথাপি মামলার নিষ্পত্তি হইল না।

হিমালয় বাবু ও ভেঁইয়া মামলার খরচ যোগাইতে যোগাইতে কপর্দ্দক-বিহীন হইয়া পড়িলেন। অযথা অর্থনাশ ও অর্থ চিন্তায় তাঁহারা দিনে দিনে শুকাইয়া মড়ার আকৃতি প্রাপ্ত

হইলেন। ওদিকে তাঁহাদের উকীল বারিষ্টারগণ বেশ চকচকে হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের নেয়াপাতি ধরণের ভুঁড়ি গজাইয়া উঠিল। অবশেষে ভেঁইয়া সত্য সত্য এক দিবস কপর্দ্দক-হীন হইয়া লোটা কম্বল বাঁধা দিয়া গয়াধামে পলায়ন করিলেন। পুনশ্চ মামলার দিন তিনি আর আদালতে হাজির হইলেন না। এদিকে হিমালয় বাবুও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথে বসিলেন। তিনিও আর মামলা চালাইতে পারিলেন না। উক্ত মামলার নিষ্পত্তি এই প্রকারে হইল। অনেক মামলার নিষ্পত্তি এই প্রকারেই হইয়া থাকে।

দুর্দ্দিন একলা আসে না, অনেক বিপদ আপদ সঙ্গে করিয়া আনে। হিমালয় বাবু সর্ব্বস্ব হারাইয়া পথে বসিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই, তিনি দুরন্ত বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া নিদারুণ কষ্ট পাইলেন। অনেকদিন পরে আরোগ্য হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার একটী চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল। এক্ষণে তিনি অক্ষম, আতুর বলিলেও হয়। কোন কারণে তাঁহার সে বড়-বাবুগিরী চাকুরিটী অনেক দিন গিয়াছিল। যে সম্পত্তির মোহে অন্ধ হইয়া তিনি অনাথা কেরাণীদের প্রতি অত্যাচার করিতেন, এক্ষণে সেই সকল কেরাণীর মধ্যে অনেকে তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করিয়া থাকেন। আমাদের নগেন্দ্র তন্মধ্যে একজন প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন। নগেন্দ্র এক্ষণে সংসারে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে কলিকাতা সহরের একজন গণ্য মান্য ব্যক্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নগেন্দ্রের ধৈর্য্য, বীর্য্য, সৎসাহস, ধর্ম্মনিষ্ঠা, পরোপকারীতা প্রভৃতি অনেক গুণ ছিল। সেই সকল এক্ষণে

সময়গুণে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। আর তাঁহার স্ত্রী প্রভাবতীর গুণে ও গৃহিণীপনায় আত্মীয় স্বজন, দাস, দাসী, প্রতিবাসী সকলেই সন্তুষ্ট ছিলেন। প্রভাবতী নিজগুণে সকলের নিকট হইতে দুই হাতে ভালবাসা কুড়াইতে ছিলেন। গৃহিণীপনায় প্রভাবতীর বিচারশক্তি ও দৃষ্টি অতিশয় প্রশংসনীয় ছিল। রজনী এক্ষণে অনেকগুলি পুত্র কন্যার মা হইয়াছেন। একদিনের একটীমাত্র ঘটনায় রজনীর জীবন-নাটকের স্রোত ফিরাইয়া দিয়াছিল। এক্ষণে অনেক রমণী তাহার নিকটে পতিভক্তি, পতিপ্রেম শিক্ষা করিয়া থাকে। ঠাকুরদার সারথীদ্বয় কাশীবাসিনী হইয়াছেন। হরেন্দ্র ও নগেন্দ্র ইহাদের মাসহারা দিয়া থাকেন। যোগেশ বাবুও কিছু কিছু পাঠান এই সকল ঘটনার বহুদিন পরে এক দিবস বিন্ধ্যাচলে হরেন্দ্রের সহিত সুরেশের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া সুরেশচন্দ্র বিন্ধ্যাচলে সাধুসন্ন্যাসীর সহিত নির্জ্জনে জীবন-যাপন করিতেছিলেন।

